দেশান্তরের নারী

শ্রীসাধনা বিশ্বাস

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী
কলিকাতা—১২

প্রকাশ করেছেন
কণক দত্ত
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী

ছেপেছেন
দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া,
৩।১ মোহন বাগান লেন,
কলিকাতা—৪

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন
ঊষারঞ্জন দত্তগুপ্ত

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী,
১৬।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২
ফোন—৩৪-২৭৬৮

আমার মাকে

ভূমিকা

কিসের কি বৃত্তান্ত কোন ভূমিকা না করেই কল্যাণীয়া সাধনা এসে খাড়া হুকুম দিলেন—'ভূমিকা লেখো।' ভূমিকা লেখা ভূমিস্মাৎ হওয়ার চাইতে অনেক কঠিন। হকচকিয়ে উঠলাম। অভয় দিয়ে কাগজের গোছা সামনে ফেলে দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

পড়ে দেখলাম ভূমিকা নিতান্ত বাহুল্য। শ্রীমতীর দেশান্তরের নারীরা বাংময়ী। তাঁরা শুধু স্ব-প্রকাশ, স্বয়ংপ্রভ নন। লেখিকার যে পরিচয় তাঁদের কাছে পেলুম মুগ্ধ হবার মত, এবং না হয়ে পারলুম না।

শ্রীমতী গিয়েছিলেন পড়তে বিলেতে, যেমন আরো অনেকে যান এবং ফিরে আসেন পাশ করে বা না করে, ওদেশের নদী, পাহাড়, দোকান—রেস্তরাঁ, কাফে-কফি, রং-জৌলুষ, বাইরের উল্লোল-হিল্লোল দেখে এবং কিছুটা বা তার রং ঝাঁঝ্ সাথে নিয়ে। শ্রীমতী সাধনা পাঠান্তে ঘুরেছেন প্রায় সারা ইয়োরোপ এবং দেখলুম ঘুরেছেন বাহিরের সাথে মানুষ ও মাটির গভীরে চোখ, কান ও হৃদয় মেলে এবং দেখেওছেন তাঁর সার্থক দৃষ্টি দিয়ে। তাই দেখতে পেয়েছেন ওদেশের মাঝে এদেশের মালঞ্চমালাকে; রেলের ভিড়ে এদেশের দিদিমা-ঠাকুমার মত নাতি—নাতনীর জন্য পোঁটলা-পুঁটলী কোলে করা বৃদ্ধার স্নেহ গভীর অন্তরটিও তাঁর চোখ এড়ায়নি। আর্টের ব্যর্থ স্বপ্ন বুকে বওয়া এঞ্জেলের বেদনা, যুদ্ধ বিধ্বস্ত

সুন্দরী আইরিণের জীবন সাধনা, ইভা, মিসেস্ রবিনসন্, মিস্ লোভেল, শ্রীমতী লণ্ডবার্গ—এঁদের কেউ অসাধারণী, কেউ বা নিতান্ত সাধারণী। কেউ সুন্দরী, কেউ কুৎসিৎ, কেউ বিদুষী, কেউ বা তার বিপরীত। একটি সমগ্র প্যাটার্নের এক একটি অংশ এঁরা। এঞ্জেল, ইভারা এক একটি প্রতীক বা ঈঙ্গিত মাত্র।

শ্রীমতী সাধনার কলমের তুলিতে পাশ্চাত্য দেশের নারী-জগতের যে ছবি পেলুম এই ঈঙ্গিতের মাধ্যমে, শুধু ছবি নয়; পরিচয় দিগ্দশন। আরও একটা লক্ষ্য করলুম সত্যিকার লড়াই'এর হুঙ্কারের সাথে "শান্তির লড়াই" এব পাঁয়তারার দাপটে ত্রস্তা পৃথিবীর মর্ম থেকে উঠ্ছে কি করুণ অথচ বলিষ্ঠ শান্তির আকুতি! বিগত যুদ্ধের আগুনে ঝলসান ইয়োরোপের প্রতিটি দেশের অন্তর থেকে ধ্বনি উঠছে—"যুদ্ধ চাইনে, আর যুদ্ধ চাইনে।" সে ধ্বনিও কানে পৌঁচেছে লেখিকার। আমরাও বলব—শোন বিশ্বজন, ওই মর্মোৎসারী শান্তিকামীর ভাষা।

শ্রীমতীর প্রথম কলম ধরা। কিন্তু সুষ্ঠু শব্দ বিন্যাসের সাথে চমৎকার একটি সহজ ছন্দ একটা মজ্লিসী সুর আছে ওর লেখার মধ্যে যা এ ধরণের লেখার পক্ষে সবচেয়ে যোগ্য ও সুন্দর আঙ্গিক।

এটুকু বলে শেষ করব,—সাধনা, লেখ তুমি, লেখ। তোমার উপলব্ধিকে তোমার সুন্দর কলম-নিঃসৃত হতে দাও।—

পুষ্পময়ী বসু।

১৪ই আগষ্ট। ১৯৫৪ ইং



—দেশান্তরের নারী—

এক

রূপকথায় পড়েছিলাম ;—মালঞ্চমালা কুঁড়ে ঘরের মেয়ে, অপেক্ষা করছে বনের প্রান্তে হঠাৎ দেখা রাজপুত্রের জন্য। রাজপুত্র বলে গেছে আসবে, কুঁড়ে ঘর থেকে সে যাবে রাজপুত্রের রাজধানীতে। কিন্তু সে আর আসছে না, তার অপেক্ষা উদ্বিগ্নতায় মিশে মলিন করে রেখেছে তাই মুখখানাকে।

আমরা কেউ কি ভাবতেও পারি—গল্পের মালঞ্চমালাকে দেখা যেতে পারে দেশান্তরের মাটিতে, সাধারণ ঘরে ?

মিষ্টি মুখখানা ; বাঙালী মেয়ের মতোই ভীরু দু'টি চোখ। রোগাটে ধরণ। লিপষ্টিক লাগানো মুখ, কিছুটা ফ্যাকাশে মনে হয়। নার্সের কাজ করে লণ্ডনের একটি নামকরা হাসপাতালে।

আলাপ Student Movement Houseএ। মিসেস্ র‍্যাড্‌লী মুভমেণ্ট হাউসের কর্ত্রী ; মিস্ আগাথা হ্যারিসনের সঙ্গে ভারতে এসেছিলেন ১৯৩৮ ইংরেজীতে। মহাত্মাজীর কথা বলেন এখনো আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে। আমাকে ডেকেছিলেন, "সমাজে বর্তমান ভারতীয় মেয়েদের স্থান" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে। নানা দেশের মেয়ে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই

সাধারণ ঘরের মেয়ে; কেউ স্কুলে কাজ করেন, কেউ সাহায্যকারী হিসেবে কারো বাড়ীতে থেকে আয় করে পড়াশুনা করছেন; কেউ বা নার্স, কেউ বা এক সঙ্গে দু'টো কি তিনটে কাজ করেন। ভারতীয় মেয়েদের কথা এবং সমাজে তাদের বর্তমান স্থান—ইত্যাদি সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ তাদের প্রচুর।

প্রশ্ন, উত্তর, সমালোচনা, তুলনামূলক আলোচনা ইত্যাদিতে প্রায় দু'ঘণ্টার ওপোর হলো। যে দেশে দু' মিনিট সময়েরও হেরফের হওয়া অশোভন কাজ, হাতঘড়িতে যে দেশের লোকের দৃষ্টি পড়ে ঘন ঘন, সেখানে আড়াই ঘণ্টা সময়;—ওঃ অনেকখানি।

বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা, পিট্‌পিট করে বৃষ্টি ঝরছে। ভারী কোটটি গায়ে চড়িয়ে বেরুতে যাচ্ছি এমন সময় অতি কাছে এসে, যেন কেউ না শোনে এমনভাবে ইংরেজীতে বললে একটি মেয়ে—"আমি ভারতবর্ষকে ভালবাসি।" "ধন্যবাদ, অত্যন্ত খুশী হলাম" বলে পা বাড়াতে যাচ্ছি—মনে হোল আরও কিছু সে বলতে বা জানতে চায়। "আমি একটু লাজুক, সকলের মাঝে কোন প্রশ্ন তোমাকে করতে পারিনি, কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ আমার প্রচুর।" এবার নেহাৎ ঘনিষ্ঠ হয়ে এল আলাপ, বললে—"আমার সঙ্গে এক কাপ কফি খেলে অত্যন্ত সুখী হবো।"

ইউনিয়ানের ওপোরের তলায় ক্যানটিন আছে। চা, কফি, দুধ, স্যাণ্ড্‌উইচ, কেক—সবই পাওয়া যায়। সভ্য শ্রেণীভুক্ত

মেয়েরাই "ক্যানটিন্" চালায় এবং তদারক করে। ঘরের এক কোণে একটি জায়গা বেছে বসলে, এরই মধ্যে আরও দু'জন মেয়ে এসে যোগ দিলো আমাদের সঙ্গে। মেয়েটির মুখখানা একটু ম্লান হয়ে গেলো। মেয়ে দুটি না ওঠা পর্যন্ত সে শুধু কফির পেয়ালাতে চুমুকই দিয়ে চললো।

ছোট্ট নোট বইটি। অনেক নামের মাঝে পেন্সিলে লেখা একটি নাম; না বলে দিলে বুঝতেই পারতাম না সে ভারতীয় নামের পদবী।

"তুমি কি একে চেন? পদবী দেখে বলতে পার নাকি এ কোথাকার লোক?"

সম্ভবতঃ বম্বের। সেখানকার আন্তর্জাতিক পরিবেশে কে যে কোন শ্রেণীর লোক বলা মুস্কিল; অন্ততঃ আমার পক্ষে তো বটেই।

উদ্‌গ্রীবভাবে তাকিয়ে থাকে মেয়েটি। জানাই তাকে এত বড় দেশ ভারতবর্ষ, পদবী দেখে নির্দিষ্ট কোন জায়গার কাউকে কি চেনা যায়? আমি জন্মেছি এক প্রান্তে, আর বম্বে অন্য প্রান্তে!

আবার প্রশ্ন।—"একি খুব বড় ঘরের পদবী? সে আমাকে বলেছিল তার জন্ম খুব সম্ভ্রান্ত ঘরে; ধনী তারা।"

ফিস্‌ফিস্ করে আবার বললে—"কাউকে আমার এসব কথা বলো না, এমন কি তোমার অন্য বন্ধুদেরও না, তারা হাসবে। এ নামটিও জোরে উচ্চারণ করো না।"

আরও এক কাপ কফি এলো। এত ভূমিকা দেখে রীতি-মতো ঘেমে উঠেছি। কিন্তু মেয়েটির সুরে যে আন্তরিকতার রেশ ছিল তাকে অপমান করতে পারলাম না।

"আমি হাসপাতালে নার্সের কাজ করি। ভারতীয়দের আমি চিরদিনই ভালবাসি। তাই এই ছেলেটিব সঙ্গে যখন পাঁচ বছর আগে আলাপ হলো তখন মনে মনে অত্যন্ত খুশী হলাম, এর আগে ভারতীয় কোন বন্ধু আমার ছিল না। পাঁচ বছব ধরে আমাদের জানাশোনা। সে আমাকে বলেছিল ভালবাসে, এবং সেভাবেই আমার সঙ্গে এতদিন মেলামেশা করেছে। আমিও জানতাম সে আর দেশে ফিরে যাবে না। ব্যবসা উপলক্ষে এসেছিল, সে কাজ নিয়ে থেকেই যাবে। হঠাৎ আজ থেকে মাস দুই আগে এসে জানাল তার বাড়ী (বম্বে) থেকে জরুরী চিঠি এসেছে। বিশেষ দরকারে তাকে দেশে ফিরে যেতে হবে, দু'মাস পরেই ফিরে আসবে। পৌঁছেই খবর দেব'র কথা ছিল। কিন্তু আজ দু'মাসেরও বেশী হতে চললো তার একখানা চিঠিও পাইনি। ভেবেছিলাম, আমি এজন্যে চিন্তা না করে পারবো। ঘাবড়াবো না এই পণও ছিল। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে বুঝতে পারছি, তাকে ছাড়া আমি থাকতে পারবো না। আগে অতটা বুঝতে পারিনি···। তুমি আমাকে সাহায্য করতে পার না কি? ইণ্ডিয়ার সব কথা তুমি তো জান।"

চুপ করেই রইলাম।

"—তুমি ভারতীয় মেয়ে, সেখানকার সামাজিক রীতি-নীতির কথা তুমি তো জান সবই। ভারতীয় সব ছেলেরাই কি এদেশে আসার আগে বিয়ে করে আসে? সে কিন্তু শপথ করেছিল যে বিয়ে করেনি।"

অমন মিষ্টি মুখখানার পাংশুটে ভাব ও অস্থিরতা দেখে চুপ থাকা অসম্ভব হয়ে উঠলো। ছেলেটিকে চিঠি লিখে জবাবের অপেক্ষা করতে বুদ্ধি দিলাম।

—"যদি সে চিঠি না লেখে?"

—"তা হলে মানিয়ে নেওয়া ছাড়া তো উপায় নেই।"

মেয়েটির মুখের ভাব আমার ভেতরে গিয়ে দোলা দিলো কিন্তু এ ব্যাপারে আমি কিই বা করতে পারি! জানিনা, চিনিনা ছেলেটিকে!

বাইরে বৃষ্টি চলছে। অন্ধকার ঘন হয়ে জমেছে গ্যাসের আলোর আশে পাশে। নির্জন রাস্তা "হলোওয়ে রোডে" যেতে হবে আমাকে। বিদায় নিতে চাইলাম।

—"চল তোমাকে পৌছে দিয়ে আসি। অনুমতির অপেক্ষা করলেনা। "ইউষ্টন" টিউব ষ্টেশনে নেমে অপেক্ষা করতে হলো পরের গাড়ীখানার জন্য। সামান্য কয়েক মুহূর্তের জন্য প্রথম গাড়ীখানা ধরতে পারলাম না।

—"আমি কি করবো যদি জবাব না আসে?"—যতক্ষণ গাড়ী না এলো মেয়েটির শুধু একই প্রশ্ন।

গাড়ীতে উঠে বললাম: "তোমার শুভ কামনা করছি।

ভাগ্য তোমার প্রতি প্রসন্ন হোক, ভগবান কল্যাণ করুন।"

গাড়ীর কাঁচের ভেতর দিয়ে অনেকক্ষণ দেখা গেল বিষন্ন করুণ মুখখানাকে।

আজও আমি তাকে মনে করি। আমার দেশের শতো শতো মেয়ের সমগোত্রীয় সে। সাধারণ জীবনের শান্ত সুষমা আমাদের যেমন টানে, পরদেশী মেয়েকেও টানে। সিনেমা জগতের মেয়েরাই শুধু সে দেশের পরিচয় নয়। আমার দেশের অখ্যাত জীবনের ক্লান্ত বেদনার মতো ঐ দেশের বুকেও বাজে সে বেদনা,—পূব পশ্চিম বলে সেখানে কোন বিভাগ নেই।

মেয়েটি জাতিতে ইংরেজ!

দুই

"সেণ্ডোরা (Sandora), আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি"—ক্লান্ত হয়ে উঠতো এঞ্জেলের নীল চোখ, ভূমধ্যসাগরের মত ঘন নীল। আমার নাম উচ্চারণ করতে পারতনা; সাধনা হয়ে দাঁড়ালো সেণ্ডোরা।

পিটার এঞ্জেলের স্বামী, বছর সাত হয় বিয়ে হয়েছে। বুল্‌গেরিয়ান (Bulgarian) হলেও বিয়ে করার পর ইংল্যাণ্ডই পিটারের বাড়ী, আর তিনি ইংল্যাণ্ডেরই নাগরিক।

কতো স্বপ্ন জীবনের। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে এঞ্জেল। বি. এ পাশ। শিল্পের দিকে প্রচুর টান, "উইক্ ডে"তে ছোটে কোথায় কে আর্ট সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছে, আর কোথায় কখন শিল্প-প্রদর্শনী হচ্ছে। ডাচ্ শিল্প রসিকদের বর্ণনায় ওর আনন্দ উপচে পড়তো।

কিন্তু সমস্যা বিজড়িত সাধারণ জীবনে শিল্পীর স্বপ্ন কিছুটা মায়ামরীচিকা। তাই পিটারকে যখন রাত জেগে "বি. বি. সি" থেকে বুলগেরিয়ান ভাষায় খবর পাঠাবার আয়োজনে ব্যস্ত থাকতে হয়, রান্নাঘরের খাবার টেবিলে বসে একটুখানি জায়গা করে নিয়ে এঞ্জেলকে তখন তারই রচনার ইংরেজী অনুবাদ করতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে টাইপও। পিটার ইংরেজী ভাল জানে না।

বয়স তিরিশের মতো। ইংরেজ মেয়ের তিরিশ বছর তো মাত্র জীবনের স্থরু!

ঘন নীল সান্ধ্যপোষাকে একদিন তাকে দেখি বাথ্রুমের আয়নার সামনে। বিয়ের আগে নাচে নাম ছিল, সখও ছিল; সংসারের চাপে সেদিনকে তাব ভুলে যেতে হয়েছে। আজ বেশ কিছু দিন পর হাতে সময় এসেছে, তাকে উপভোগ করতে চায় সে। অনেকটা বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ের সিনেমা যাওয়ার মতো। সিড়ির কাছে, বেরোতে গিয়ে চোখ পড়লো আমার উপর।

"কোথায় যাচ্ছ নীলবসনা স্থন্দরী?"

"নীচে। ক্লাবে যাচ্ছি—।"

কথার স্থুরে উৎসাহ নেই, আছে গোপন রাখা ক্লান্তি। শরীরটা নষ্ট হয়ে গেছে। সান্ধ্যপোষাকের ওপোরের খালি অংশে শরীরের অনেকখানিই অনাবৃত—শীর্ণতার স্থুস্পষ্ট ইঙ্গিত তাতে। পরিশ্রম করতেই দিন যায়, রাতে অনেক যত্নে "ক্লীপ" লাগিয়ে চুল কোঁকড়ানো করবার অবসর কম, তাই চুল ও শ্রীহীন। গালে রং লাগাবার সময় স্থযোগও সীমাবদ্ধ। আজ হঠাৎ—রুজ—লাগানো গাল ছ'টো অনুজ্জ্বল। আমি ঠিক জানি এঞ্জেল কি ভাবছে সে মূহূর্তে!

'তোমার সন্ধ্যা ভাল কাটুক।"

"বুড়ো হয়ে গেলাম সেণ্ডোরা—"

অতি করুণ শোনালো কথাটি কানে।

গল্পটি ঠিক মনে করতে পারছিনা। কোন নাম করা বিদেশী লেখকের উপন্যাস হবে। সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত প্রেমিক জীবন-সায়াহ্নে বিগতশ্রী প্রেমিকাকে বলছে—"তুমি কি মনে কর, তোমাকে কোনদিন আমি ভালবেসেছিলাম? সে তোমার—স্বাস্থ্য সৌন্দর্যকে মাত্র!" মেয়েটির পাউডার মাখা নিষ্প্রভ দুটি গাল বেয়ে টস্ টস্ করে ঝরে পড়ছে বিন্দু বিন্দু অশ্রু। সামনের দেওয়ালজোড়া আয়নাটি তাকে ব্যঙ্গ করছে। আজ এঞ্জেলের কথা কটিও ঠিক ঐ রকম বেদনার কাতরতায় আমাকে স্পর্শ করলো।

"হলোওয়ে রোডে"র অধিববাসীরা "ক্যাম্পডেন টাউনে"র মত সমৃদ্ধ নয়। দরিদ্র তারা।

এ অঞ্চলে নতুন ভাড়া নেওয়া হয়েছে বাড়ীখানা। গত যুদ্ধের সময়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল। ইস্‌লিংটন পৌর সভার দৌলতে বাড়ী উঠেছে আবার। অনেক সাহস করে বাড়ী ভাড়া করেছে এঞ্জেল।

পেয়িং গেষ্ট রেখেছে। আইরিশ, জার্মাণ, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ও ভারতীয় নিয়ে আমরা ছ'জন ছাত্র। দু'টি ছেলে মেয়ে তার নিজের।

"আমার অত্যন্ত দুঃখ হয়, এত অল্প বয়সে ওর দুটো ছেলে মেয়ে" পিটার বোঝে এঞ্জেলের দুঃখ। কিন্তু সে দুঃখের অংশীদার সে তো নিজেও। বিব্রত চেহারা তারও।

মেয়েটির টিংটিঙে পা গুলো, বেরিয়ে আসা পেটটি আর

শীর্ণদেহ ভীরু ছেলেটি। এঞ্জেল মাথা নেড়ে বলে "শেইম্"। স্বাস্থ্যহীন ছেলেমেয়ে শেইম্ বই কি।

সকাল বিকাল—দু'বেলাই রান্নার যোগান দিতে হয়। ছ'জন অতিথির মর্য্যাদা রেখে খাবার দিতে হবে, ঠিক সময়েই তা চাই। সকালে ব্রেক্‌ফাষ্ট, সন্ধ্যায় ডিনার, শনি-রোববার দুপুরে লাঞ্চ, আবার চারটেয় চা। অতিথি অভ্যাগত আসে মাঝে মাঝে। কোন ভনিতার অপেক্ষা থাকেনা, তাদেরও ডাক পড়ে খাবার টেবিলে।

রোববার বিকাল,—ছেলেটিকে নিতে হয় সান্‌ডে স্কুলে; সকালে ছোট মেয়েটিকে খোলা হাওয়ায় দিতে হয় বেড়াতে। গেস্টদের ঘর পরিষ্কার, বিছানাপত্র ঠিক করা, নিজেদের কাপড় জামা পরিষ্কার করা সব কাজ তো আছেই, সেখানে সোমবারও যা রোববারও তা!

বড়দিনের ছুটি আছে, গরমের ছুটিও আছে। ছাত্রেরা চলে যায় বাইরে, নতুন লোক আসে ঐ ক'দিনের জন্য। তাদেব পরিচর্য্যা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসি আমরা—ছাত্রেরা। বড়দিনও যা, গরম কালও তাই!

গত ছুটিতে (১৯৫৩-জুলাই) আমরা ইউরোপে গেলাম, এঞ্জেল বললে সে যাবে স্পেইনএ। ছেলেমেয়ে দুটিকে রেখে যাবে। ঘুরে বেড়াবে সাগরের তীরে; গ্রীষ্মে স্পেইনের উজ্জ্বল রোদ নাকি স্বপ্নের ঈশারায় ডাকে, ছবি আঁকার স্পৃহা জাগে। সারা বছর সে জমিয়েছে কিছু কিছু এরই আশায়।

ভারতে ফিরে আসার আগের দিন এঞ্জেল এসেছিল, হোটেলে। বললে, "যেতে পারিনি সেণ্ডোরা। ছেলেমেয়েদের শরীর ভাল ছিল না।

ওর ক্লান্ত চোখের ভাষা আমি চিনি। আমি দেখেছি বাংলাদেশের পথে প্রান্তরে, গ্রামের কোলে সে চোখ—কতবার!

গালে চুমু খেলে মায়ের মত স্নেহে।—"তোমার যাত্রা শুভ হোক। আবার দেখা হবে! ভারতবর্ষে যেতে ইচ্ছে করে—কিন্তু বড় বেশী খরচ।"

চোখ মেলে চেয়ে থাকে হোটেলের প্রবেশ পথের দিকে—যেখানে গ্রীষ্মকালীন রোদ টুক্‌রো হয়ে ঢুকেছে। জনবহুল রাস্তা, মধ্যাহ্নের একটা স্তিমিত ভাব মে-ফেয়ার অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত আবহাওয়ায়। ইটের 'পরে ইট গাঁথা বাসভবনের অন্তরালে জমে থাকে যে গোপন বেদনা এঞ্জেলের দৃষ্টিটা সেখানে কিনা জানিনা; অথবা চোখ মেলে সে শিল্পীর ভাবুকতা নিয়ে দেখছে কিনা ভারতবর্ষের ম্যাপ আঁকা পথ। কিন্তু তার সে মুহূর্তের ছবির সঙ্গে আমার চোখে জাগছে উত্তর কোলকাতার রাস্তার ধারে বাসের প্রতীক্ষায় দাঁড়ানো অফিস ফেরতা মেয়েদের ছবি। লণ্ডনের হলোওয়ে রোড আর শিয়ালদহের আবহাওয়ায় যেটুকু পার্থক্য তা শুধু দু'দেশের ব্যবস্থা ও প্রথায়—নইলে ভেতরের কথাটুকু একই; নিরাশার কালোমেঘে সামনের পথরেখা—অস্পষ্ট।

মেয়েটির প্রকৃত নামটি গোপনই রাখলাম।

তিন

নভেম্বর মাস। দুর্দান্ত শীত লণ্ডনে। সুরু হয়েছে বরফ পড়া। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি। রাস্তা-ঘাট বরফ গলা জলে ছপছপে হয়ে আছে। রেনকোটের হুড্ উড়ে যাচ্ছে হাওয়ায়। ট্রাফিকের হেড্লাইট গুলো দূর থেকে অস্পষ্ট অস্বাভাবিক দেখা যাচ্ছে।

ডাঃ মিস্ পাবিজা ও আমি বেরিয়েছি সন্ধ্যেবেলায়, ডিনার খেতে! গিলফোর্ড ষ্ট্রীটের কাছে একটি ইটেলিয়ান কাফেতে আমবা খেয়ে নিতাম, খরচ কম বলে। এক ডিস্ গরম টমাটো স্যুপে ভরে যেত পেট। তারপর একটা "সেভাউরী ওম্‌লেট্", সঙ্গে "পটেটো চীপস্ বা আলু ভাজা, সবটুকু খেয়ে উঠতে পারতাম না। সঙ্গে চা অথবা কফি—সব মিলিয়ে তিন শিলিং-এর উপর দামই উঠতো না, তবে দু'শিলিং, বড়জোর আড়াই শিলিংই প্রায়—আমাদের বরাদ্দ ছিল। পরিবেশটিও নির্জন। মাসিক ওল্টান্, ছবিওয়ালা,—ভালো, বাজে—সব রকমের পত্রিকা দেখার সঙ্গে চায়ে চুমুক লাগান্ অথবা মুখে পেন্সিল ঠেকিয়ে গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে বই পড়ুন (সিনেমা, স্পোর্টস্ অথবা পড়ার বই), কেউ কিছুটি বলবে না। মা, বাপ ও মেয়ে, তিনটিতে মিলে বেশ জমিয়ে নিয়েছে ছোট্ট হোটেলটি। সুব্যবস্থাও বেশ! ওপোর থেকে অর্ডার গেল মাটির নীচের

কামরায়, সেটিই রান্নাঘর, সঙ্গে সঙ্গে উঠে এলো সাজানো খাবার দড়ির ঝোলা করে,—অনেকটা লিফ্‌টএর কায়দায়।

সেদিন কাফের সামনে পৌঁছে দরজা ঠেলে ঢুকতে যাচ্ছি হঠাৎ নজরে এলো, পাশের কামরাব কাঁচের দরজায় ছোট ছেলের বুকে ঝুলিয়ে রাখা টার্কিশ ন্যাপকিনের মতো ঝোলানো নোটিশটি—

"ফুল ডিনার, ছ'শিলিং।"

তারপরে ছোট হরফে সব খাবারের নাম লেখা। নতুন কাফে! চিরদিনই ঔৎসুক্য জাগাতে ওস্তাদ এই নতুন। ঢুকে পড়ি ছ'জনে। মুখ বদলানো যাবে—এ আনন্দেও কিছুটা।

ঘরের ছ'ধারেই খাবারের টেবিল সাজানো রয়েছে যেমন থাকে অন্য কাফে বা হোটেলে। কিন্তু আমরা ছ'টি মেয়ে ছাড়া অন্য কোন খদ্দের চোখে পড়লোনা। দরজা খোলার সঙ্গে, টুংটাং আওয়াজ হতেই এক বৃদ্ধা মহিলা এসে বললেন—"গুড্‌ ইভ্‌নিং"!

জানলার ধার ঘেষেই একটা টেবিলে বসে পড়ি! বৃষ্টির ছাটে জানলার কাঁচগুলো আবছা হয়ে আছে। ছ'একবার রুমাল দিয়ে মুছে দৃষ্টি গলাতে চাইলাম বাইরে। ঝম্‌ঝমে বৃষ্টির ছপছপে আমেজ মনটাকে শুধু বাইরের রাস্তায় টানছিল। "বৃষ্টি ভরা এই সন্ধ্যেবেলা"—বাংলা দেশের ভরা বর্ষার-রূপটি মনের আনাচে কানাচে উঁকি মেরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আনমনা

ভাবটি কেটে যেতেই খেয়াল হলো, খাবারের অপেক্ষায় আছি বেশ খানিকক্ষণ।

বৃদ্ধামহিলা সেই যে দেখা দিয়ে গেলেন আর সাক্ষাৎটি নেই। এদিক ওদিক তাকাতেই নজরে আসে স্বল্প দূরেই একখানা স্ক্রীন ঘেরা ছোট জায়গা থেকে রান্নার ছ্যাক্‌ছুক শব্দ আসছে।

আমাদের ঠিক পেছনেই ফায়ার প্লেসের সামনে ছোট্ট ফুলের টব, আগুন নেই কোথাও। শীত যেন জমেছে ঘরের ভেতর। ইলেক্‌ট্রিক্ ফায়ার দেখব কল্পনা করলাম, তাও নয়।

মহিলা এলেন এবার গরম টমাটো সুপ নিয়ে, ডিসের অর্ধেক প্রায় খালি। বাকী খাবারের অর্ডার নিয়ে আবার চলে গেলেন। ঐটুকু স্যুপে ক্ষিধে যেন আরও বাড়িয়ে দিল। কি করব ভাবছি। ঠিক এমনি সময়ে এলেন আরও দু'জন ভদ্রলোক। পত্রিকা আড়াল করা মুখে এবার তাদের অপেক্ষার পালা। অবশ্য ধৈর্য ইংরেজ জাতির মজ্জাগত গুণ, সহ্য-শক্তি তো বটেই।

বুঝলাম এবার, ঐ মহিলা ছাড়া এ কাফেতে দ্বিতীয় প্রাণীটি নেই। সবদিক সামলিয়ে ভাল রাখতে পারছেনা একা।

ভেড়ার মাংস ভাজা এনে দিয়ে মহিলাটি অন্যদের দিকে নজর দিলেন। ঠাকুরমার বয়সী, ঝুলে পড়া চামড়ার ফ্যাকাশে শাদা রং শীতে আরও কোঁচ্‌কানো। একটা পা ফোলা, তাড়াতাড়ি চলতে গিয়ে মেঝেতে বিচ্ছিরি রকমের সপ্‌সপে

গোছের শব্দে বিরক্তি জাগাচ্ছেন। পারিজা ও আমি দু'জনেই চুপচাপ বসে আছি। এত দেরীতে এক একটা ডিস আসছে, তাও পরিমাণে কম। উঠে পাশের সেই ইটেলিয়ান কাফেতেই যেতে ইচ্ছে হোল। কিন্তু সহানুভূতি তরল হয়ে এলো দু'জনেরই।

—"আহা বুড়ো মানুষ, এক ফোঁটা আগুন নেই কোথাও, এ শীতে এমন করে খাটতে হচ্ছে।"

পারিজার কথায় সায় দিলাম। কিন্তু আমার অবস্থা কাহিল। বরফপড়া শীতের হাড়কাঁপানো রাতে লণ্ডন সহরে ঠিকমতো গরম খাওয়াটি পাননি যারা তাদের মনের অবস্থা অন্য কেউ বুঝতে পারবেন না। আনতে নিতেই তো খাওয়া আরাম অর্ধেক মাটি ;—তাল কেটে যাচ্ছে বারবার, গরম তো বাষ্পাকারে প্রায় উবু উবু।

—"বুড়ো হাডে হোটেল চালাবার দুর্বুদ্ধি মহিলার কেন হলো ভাবছি। আত্মীয় স্বজন তার কি কেউ নেই? এ কাজে অন্ততো সাহায্য তো করতে পারে? ছেলেমেয়েরাই বা কোথায়? এ বয়সে তো নাতীনাত্নী নিয়ে খেলার সময়, নয়তো বড়জোর টুকটাক্ কোন কাজ নিয়ে পরকালের চিন্তা!" পারিজা হেসে উঠলে আমার কথায়।

—"আরে বোকা, একি আর বাংলাদেশ যে বুড়ো মানুষকে কাজ করতে দেখলে সকলে "ছি, ছি," করবে নবীন সমাজকে কটাক্ষ করে? এ হলো গিয়ে পশ্চিম। পারিবারিক জীবন

এখানে অন্য সুরে বাঁধা। মা-বাবা মিলে পরিবার। ছেলে বড় হলো, বিয়ে করে সে চলে গেলো স্ত্রী নিয়ে ;—সেই তার পরিবার। মেয়ে বড় হলো, কাজ পেলো, বিয়ে করলো, চলে গেলো। তার পরিবার হবে আলাদা। এখন বুঝতেই পারছ —বুড়ো মানুষের আর কোন পরিবারেই স্থান হয় না। যৌবনের জয়গান পশ্চিমে। হিসাবী বুদ্ধি তাই কোন মূল্যই দিতে পারে না বৃদ্ধ বয়সের, কারণ অকর্মণ্য সে বয়স। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এখন মস্তো সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছেন পশ্চিমের প্রায় সকল দেশেই।”

এবার পরিষ্কার হয়ে গেলো আমার চোখে ইংল্যাণ্ডের বর্তমান সমাজ রূপ। মনে পড়ছে,—ওয়েষ্ট মিনিষ্টার অ্যাবি দেখতে গিয়েছিলাম—রাণী এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেকের আগে। ত্ব’তিন দল বৃদ্ধা মহিলা গিয়েছিলেন সে সময়ে। দল দেখে একটু বিস্মিত হলাম। বন্ধু শ্রীমতী জয়েস্ জবাব দিয়েছিলেন—“এরা ওল্ড্ ম্যান্স্ হোম থেকে এসেছেন অ্যাবি দেখতে। বুড়ো হয়ে গেলে সরকার যাদের কাজ থেকে অবসর দিয়ে দেন, তাদের মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থাও করেন। অল্প খরচে তারা কোন হোমে থেকে আদর যত্ন পেতে পারেন অথবা কোন হোটেলে থাকতে পারেন অর্থের বিনিময়ে।”

—জীবনের শেষ সময়ে এসে আত্মীয় পরিবার, বন্ধুবান্ধবের সম্পর্ক ছেড়ে হোটেলে বা হোমে থাকার ত্বর্দিন যেন আমাদের না আসে।”

—“না এসে পারছে কৈ ? সে হাওয়া পূর্ব কুলকেও নাড়া

দিয়েছে—বৈকি। তবে সত্যি বলতে,—বুড়ো মা, বাবা, দাদু, দিদিমার এখনো আমাদের সমাজে যে প্রতিপত্তি ও সম্মান আছে—ইউরোপের দেশগুলিতে তা আজ নেই। কালের বিবর্তনে দেখছ তো এ মানুষটির হাল। আমাদের সমাজও পাল্টালো বলে—"

পারিজা জবাব দিলে।

ঝড় চলেছে বাইরে। থামার লক্ষণ নেই। হাতের দস্তানা খুলে পর্যন্ত বসতে ইচ্ছে করছে না। এমন জবুথবু ভাব। এক কাপ "হট্-টি" না পেলে চলছে না আব। বুড়ো মানুষটি দুটো পয়সা বেশী পাবে মনে করে শেষ পযন্ত চায়ের অর্ডারও দিয়ে দিলাম।

হাল্কা জলো চা'য়ে চুমুক দিয়ে বলি—

—"চমৎকার তো তোমার চা!"

—"ধন্যবাদ!" বুড়ীর মুখে করুণ হাসি।

ঘোলাটে হয়ে গেছে চোখ, ফোলা সে চোখের কোল। স্থবির, কালের কবলে। শণের মতো পাকা চুল।

দরজা খুলে এগিয়ে দিল ফেরার সময়। বললে—খাওয়া ভাল লাগলো তো? আবার এসো।

—আসবো আবার। বন্ধুদেরও পাঠাবো। খুব ভাল খেয়েছি—

মিথ্যে বলে এলাম। পাশের জনবহুল উষ্ণ ইটেলিয়ান কাফের পাশে এ যে কতো ম্লান ও করুণ—সে কথা কি

২

আমরা বুঝিনি? তাই ওকে বলতেই হলো—ভালো খেলাম।

যাকেই সামনে পেলাম, একবার করে বলে নিলাম নতুন কাফের কথা। এক সপ্তাহ আমাদের আর সময় হলো না ওখানে যাবার। একদিন সন্ধ্যেবেলা গিয়ে দেখি সেখানে অন্য সাইন বোর্ড। কাফেখানা উঠে গেছে, আলো জ্বলছে না ঘরে।

কেমন যেন একটু কষ্ট হলো। কে জানে বৃদ্ধা বেঁচে আছেন কি না!

ইংরেজ সমাজে আশী বছরের বৃদ্ধাকেও খেটে খেতে হয় স্বজনহীন পরিবেশে; এ দৃশ্য আমাদের দেশে বিরল বললেও কি বেশী বলা হয়?

চার

এক ঝলক প্রভাতী রোদের মত সুন্দরী আইরিণ। লম্বা হাত "নাইলনের" কালচে নীল পোষাকের সঙ্গে অতি সামঞ্জস্য রাখা মুখ-চোখ আর সোনালী—ঝাঁকড়া চুল। কথা বলে নেহাৎ দু'চারটে। খাবার—টেবিলে সে-ই পরিবেশন করে, সবার শেষের "ডিস্‌টি" তার। গৃহকর্ত্রীর বাঁদিকে বসা আইরিণকে মনে হোত কৃষ্টি সম্পন্ন কোন অভিজাত ঘরের মেয়ে। কী দীর্ঘ দেহ! চাপ বাঁধা রক্তের মতো স্বাস্থ্য গৌরব!

আমিও কি প্রথমে জানতে পেরেছিলাম ও কে?

ভোরে ওঠে। আমাদের ভাষায়,—তখন কাক-পক্ষীও জাগে না। গৃহকর্ত্রী রাতে দেরীতে শোয়, ন'টার আগে তার ঘুম ভাঙে না। অথচ ভোর না হতেই কাঁদতে থাকে মেয়েটি। আইরিণ তখন রাতের পোষাক পরেই ছোটে তাকে তুলে নিতে। তারপর থেকে সারাদিন ঐ মেয়ের সব ভার আইরিণের।

আটটার সময় থেকে সুরু হবে ব্রেক্‌-ফাষ্ট্‌। কারো জন্য কফি, কারো জন্য গরম চা! সে সঙ্গে গৃহকর্ত্রীর ছেলেমেয়েদের কাউকে ডিম সেদ্ধ, কাউকে ডিম পোচ্‌! তারপরেই কম দামের গরম ওভারকোটটি চাপিয়ে বাজারে যায় থলে হাতে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পথে বেরুবার সময় চোখে পড়ে আইরিণ আসছে

বাজার সেরে। এর পরের কাজ—বাড়ীঘর সাফ করা, বাথরুম পায়খানা সব। কার্পেট পরিষ্কার করতে—“হুভার” ব্যবহার করে কিন্তু বাথরুমের সিমেণ্ট পরিষ্কার করতে হয় কাপড় ভিজিয়ে, বাংলা ভাষায় “ন্যতা” বলা চলে তাকে।

গুন্ গুন্ করে গান করে মেয়েটিকে দুলিয়ে দুলিয়ে—“ডয়েট্শ্-ল্যাণ্ড, ডয়েট্শ্-ল্যাণ্ড ; ইউবার আলেজ—”

জার্মানরা তাদের দেশকে বলে “ডয়েট্শ্-ল্যাণ্ড্, আর জার্মান জাতি হলো “ডয়েট্শ্।”

গত যুদ্ধে হেরে গেছে জার্মাণী, তাই আজ আর ওদের কোন জাতীয় সঙ্গীত নেই। আগেকার জাতীয় সঙ্গীত ওরা গায় গোপনে, আড়ালে। বলে—“এখন তো আমাদের জাতীয় বলতে কিছু নেই।”

আইরিণের জন্মস্থান ডয়েট্শ্-ল্যাণ্ড। চুপচাপ, কখনো বড় গলায় কথা বলতে শুনিনি। সেই আইরিণকেই উত্তেজিত মনে হোত যখন যুদ্ধের বিষয় নিয়ে আলোচনা চলতো অথবা শ্বেতকায় জাতিদের সম্বন্ধে ভারতবাসীর কী ধারণা সে কথা বলতাম। ওর ভাষা যেন কুলোতো না, যখন রাশিয়া যাবার মতলবের কথা বলতাম। শক্ত হয়ে উঠতো মুখের ভাব ; আরক্ত তো বটেই।

—“তুমি কি জান ওদেশের খবর ? তুমি কি বুঝবে ? ওহ, এখনো যেন বিভীষিকার মত জাগে সে সব দিনের ছবি—”

“কিন্তু আমরাই বা ভুলি কি করে শ্বেতজাতির যুদ্ধতাড়িত

চেহারা। ইউরোপের সমস্ত দেশগুলিই চীৎকার করে শান্তি, শান্তি করে অথচ পৃথিবী জুড়ে তারাই আয়োজন করছে ধ্বংসের।"

আমি ব্রিটিশ অধীনে ভারতের চেহারা বর্ণনা করি। আইরিণ শোনে সব কথা মন দিয়ে। বিস্মিতও হয় বৈকি।

"কিন্তু পৃথিবীর উপরতলার মানুষ যখন দুঃখকে টেনে আনে সাধারণ মানুষের উপরই তার ধাক্কা এসে পড়ে। নীচের তলার সাধারণ মানুষ সব দেশেই সমান।"

এমনি কতো কথা।

রাশিয়ানদের ভয় করে আইরিণ সবচেয়ে বেশী। যুদ্ধের পরে জার্মাণীর রাস্তায় সৈন্যদের বুটের যে শব্দ হতো তা নাকি ও এখনো স্বপ্নে শোনে। পত্রিকা পড়তে তার ভালো লাগে না। সে ভুলে থাকতেই ভালবাসে সে সব দিনের কথা। পত্রিকার যুদ্ধং দেহি খবর ও ভাবধারাকে ও সহ্য করতে পারে না।

আইরিণের চিঠি আসে।

টিকিট জমানো অভ্যাসটি অনেকটা ছেলে ধরার মতো, ওৎ পেতে থাকি। ছবি আসে মাঝে মাঝে মা দাদার। খোলা চিঠি—প্রতিটি লাইন তার দাগকাটা, নয়তো কাটাকুটো। আইরিণ আবার মুখ খোলে; বলে যায় কি অত্যাচার গেছে তাদের উপর!

ওরই মুখে শোনা কথা।

সৈন্যবাহিনীতে ছিল ভাই, বার্লিনেই পৈত্রিক ভূমি। পরাজিত বার্লিন দু'টুকরো হলো—পূর্ব আর পশ্চিম। ভাই

গেল "কন্‌সেণ্ট্রেশান্ ক্যাম্পে" বন্দী হয়ে। সুখী পরিবার, ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। পূর্ব অংশ রাশিয়ার অধীন, লৌহ-যবনিকা ভেদ করা অসম্ভব। চাকরীর আশায় দু'বোন শরনার্থী হয়ে চলে এলো পশ্চিম জার্মাণীতে। কিন্তু পূর্ব হোক আর পশ্চিম হোক,—বিজিত দেশের ছেলেমেয়েদের পরাজয়ের ভাগ তো নিতেই হবে। বলে—"ঘরে এক টুক্‌রো রুটি ছিল না জমানো। একটু দুধ জোগাড় করা কি কষ্টেরই না ছিল।" তাই চলে এলো ইংল্যাণ্ডে, ইংরেজী ভাষা আয়ত্ব করে বিশেষজ্ঞ হয়ে ফিরে যাবে বলে। ওরই এক বন্ধু এ পথ বাত্‌লে লণ্ডন নিয়ে এসেছে।

এলে কি হবে! যা খরচ লণ্ডনে! উঠতে বসতে এক এক পেনী! তা ছাড়া শীতের ভালো জামা-কাপড়ও চাই। বাড়ী থেকে এক পেনীও পাবে না, সে জানে তা। এ বাড়ীতে তাই সাহায্যকারীর (helper) কাজ করছে। আমি তো সব দেখে শুনে বলি চাকরাণী সে। কিন্তু ওদেশে কাজের সম্মান (Dignity of labour) আছে বলে, এ কাজকেও রোজগারের উপায় হিসাবে নিয়েছে সে। আমাদের দেশে কাজের সঙ্গে মানুষের বিভিন্ন শ্রেণীও যুক্ত। কাপড় ধোয়ার কাজ করলে তাকে ধোপা শ্রেণীতে ফেলি, যে রাঁধে তার শ্রেণী রাঁধুনি, শিক্ষাবৃত্তি যাদের তারা মাষ্টারনী। কিন্তু ইউরোপের কোন দেশেই তা নয়। বৃত্তির সঙ্গে কারও সামাজিক বন্ধন নেই। কাজের সময়টুকুর পরে সকলেই এক শ্রেণী। এমন কি ডিয়ার, ডার্লিং,

প্লীজ্, থ্যাঙ্ক ইউ, না বলে কারও কাছ থেকে কাজ আদায় করাও শক্ত। তুমি তুইয়ের বিভেদ নেই। চাকর শব্দ ব্যবহার নেই সেখানে, যে অর্থে আমরা ব্যবহার করি।

আইরিণ সারাদিন নিঃশব্দে চাকরাণীর কাজ করতো আর সন্ধ্যেবেলা সেজেগুজে টেবিলে বসতো। ওর নীরব ভাষা-ভরা চোখ দু'টো শুধু খুঁজে বেড়াতো কার পাতে বাড়তি খাবারটুকু দিতে হবে। এরপরে ধোয়া-মোছার কাজটিও আছে।

ভারতের কথা শুনতে বড় ভালোবাসে। ড্রইংরুমের ফায়ারপ্লেসে কয়লা দিতে দিতেই সে জিজ্ঞেস করে নানা কথা। বেঠোফেন, মোজার্ট, ভাগ্নার—ইত্যাদির বিষয় বোঝায় রেডিওর চাবি খুলে। আবার "বি, বি, সি" তে ভারতীয় গানের প্রোগ্রাম থাকলে জিজ্ঞেস করে খুঁটিনাটি।

পারিবারিক জীবনে পূর্ব ও পশ্চিমের তফাৎ বোঝাতে চেষ্টা করি। ইউরোপীয় সমাজে পারিবারিক জীবন অর্থনৈতিক ডামাডোলে ভগ্ন প্রায়। ছেলে আর বাবা মায়েতে ভারতীয় জীবনের মতো মধুর সম্পর্ক নেই। বৃদ্ধ হয়ে গেলেই জীবন হয়ে দাঁড়াল বোঝা। একান্নবর্ত্তী পরিবারের কথা তারা চিন্তাই করতে পারে না। তার উপর তো আছে—"ডাইভোর্স", কথায় কথায়। ঠোটে রং মাখা মেয়েরা আমাদের সমাজে "সোসাইটি গার্ল"—ইত্যাদি।

—"তুমি তো জাননা ঠিক ইউরোপীয় সমাজের কথা। ওপোর তলার মুষ্টিমেয় কয়েকজন আর সিনেমা জগৎ দেখে

মনে কর সেটাই বুঝি সত্যিকারের জীবন। তোমাদের ছেলে-মেয়েরা আসে পড়তে, থাকে তারা হোষ্টেলে নয়তো হোটেলে। সে সব জায়গার মান তো একই, সে যে দেশেরই হোক। আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে কি একটা দেশ ও তাদের সমাজ জীবনকে জানা যায় ?"

ভালো লাগে ওর কথাগুলোর নরম আওয়াজ।

যেদিন দেরীতে ফিরি, সেদিন আমার খাবারটি যত্নে রেখে দেয়। সিঁড়ি বেয়ে নামতেই চীৎকার করে ডাকি—আইরিণ, আইরিণ! বাড়ীতে ফিরে যেমন স্কুলের ছেলেমেয়ে ডাকে মাকে বা দিদিকে, বলে—"খেতে দাও।"

এক মিনিটও দেরী হয় না। "খাবারটা গরম করে দেবো কি ?"—উত্তর আসে সঙ্গে সঙ্গেই।

আচ্ছা, যে কথা সুরু করেছিলাম! সে কথা আইরিণেরই।

—"আমরা সিনেমা জগৎ নই, সিনেমা জগৎ তোমাদেরও যা আমাদেরও তা। খবরের কাগজে যে সব ডাইভোর্সের কথা ওঠে, তারা ক'জন সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়ে তোমরা খোঁজ নিয়েছ কি ? আমি যখন বিয়ে করবো, এ জেনেই করবো যে, সে বাড়ীতে আমাকে চিরদিন থাকতে হবে।"

কিছু টাকা পয়সা জমলো, সে চলে গেল ব্রাইটনের দিকে একটা কলেজে। দু'মাসের কোর্স, এর পরে আবার ফিরে আসবে কাজে।

বাক্স গোছালো সে, বসে বসে দেখলাম। ভাল ভাল জামা কাপড় সব জমানো রয়েছে, সেগুলোই নিয়ে গেলো। পুরনোগুলো আবার পরবে ফিরে এসে। তখন সে হবে আবার সাহায্যকারী—আমাদের অর্থে চাকরাণী। এখন সে ছাত্রী।

যেদিন ঐ বড় স্যুট্‌কেসটি হাতে নিয়ে সে চলে গেল, বাড়ীর সকলেই দরজা খুলে দেখলো। ট্রেন অবধিও গেল কেউ কেউ।

কষ্ট হয়েছিল সবচেয়ে বেশী ছোট্ট মেয়ে "রেইচেলের"। আইরিণের কাছে মায়ের ভালোবাসা পেয়েছিল সে।

আইরিণের মত মেয়ের তপ্ত নিঃশ্বাস আজ ইউরোপের পথে প্রান্তরে দিশা খুঁজে বেড়াচ্ছে, বাংলা দেশ যেমন হাঁপাচ্ছে শরনার্থীর ব্যথা-জর্জর নিঃশ্বাসে।

পাঁচ

পাশের মেয়েটি দুঃখিত হয়ে বলছিল—'আন্‌কালচর্‌ড্‌" অর্থাৎ অশিক্ষিত, গেঁয়ো এরা ; তোমরা কিছু মনে করো না।

কিন্তু সে বোধ হয় জানতে পারেনি ঐ কৃষ্টিহীন, চাষা পরিবারটি আমার ভেতরে একটা সরলতার ছবি এঁকে তার মধুর রেশ রেখে গেছে।

বুড়োবুড়ী, সুইজারল্যাণ্ডের চাষী। বুড়ীর চেহারাটি এখনো মনে করি। ও রকম দিদিমা গোছের চেহারা ভোলা শক্ত। বুড়ো বেশ রসিক, দিলদরিয়া ; ভাবটিও জমজমাটে। চার্লি চ্যাপলিনও অমন স্বাভাবিক চেহারায় কারো মুখে হাসি ফোটাতে পারেন কিনা সন্দেহ।

বড় বড় দু'বোতল মদ, সেদ্ধ ডিম, এপ্রিকট্‌, পীচ্‌—আর সে সঙ্গে স্যাণ্ডুইচ্‌। ষ্টেশনে যেমন পূর্ববঙ্গের দিদিমা ঠাকুর-মাদের দেখা যায় পোট্‌লা-পুট্‌লি আর বোচকা-বুচ্‌কি হাতে, —যাচ্ছেন নাতির বাড়ী নয়তো মেয়ের বাড়ী।

বসবার জায়গা নেই। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী আমরা। দু'শ্রেণীর মধ্যে তফাৎ শুধু আসনগুলোর। দ্বিতীয় শ্রেণীর আসনে গরম আবরণ আর তৃতীয় শ্রেণীতে শুধু কাঠ—বসার জায়গাগুলোতে। তৃতীয় শ্রেণীতে ভীড় করে ওঠে সাধারণ মানুষ, জায়গা পেলো তো বসলো, নইলে ঠায় দাঁড়িয়ে। কিন্তু

তারই মধ্যে এ ওর আপন হচ্ছে, খাবার বিলি হচ্ছে, কথাবার্তা তো আছেই। দ্বিতীয় শ্রেণীর গম্ভীর পরিবেশ এখানে নেই। আমাদের মালপত্র অন্যদের বাক্সেও শোভা পেল। এর, তার, ওর জিনিষের ওপরে নীচে কায়দা করে যাত্রীরাই রেখে দিলে আমাদের বাক্স পেটরা। কোথাও ধাক্কাধাক্কি বা চোখরাঙানো আবহাওয়া নেই।

বুড়ো দাঁড়িয়েই আছে। বুড়ী একটা বাক্সের উপর বসেছে —সিটের ধার ঘেষে। লোকজনের আসা-যাওয়ার পথে বসে একটা দু'টো ঠেলাও খাচ্ছে, কিন্তু নির্বিকার। বোতল খুলছে, ডিম ভাঙ্‌ছে আর হাতে নিয়ে বুড়োর এধার ওধার ঘোরাফেরা চলছে। কেউ বাধা দিচ্ছে না। এ-জানলা ও-জানলা করে আসে বুড়ীর কাছে, আর থলি খুলে এটা ওটা বার করে বুড়ী। ছেলেমানুষের মতো আত্মভোলা স্বামীকে শুধু খাওয়াবার জন্যই এত জিনিষ এনেছে ;—সকলে বলছিল।

কিন্তু, উঁহু ; তা নয় মোটেই। কয়েকবারের পর বুড়ো এলো, এবার বুড়ী বোতল ছিনিয়ে নিল।

কুছ্‌পরোয়া নেই, দু'চারঠে কিল দিয়ে নিলে বুড়ো মনের সুখে। পরশুরামের বালখিল্য ঋষির গল্প আর হনুমানের স্বপ্ন পড়ে একা হেসেছিলাম প্রাণপণে ; ভেতরটা চাপা হাসিতে ফেটে যাবার যোগাড় হয়েছিল। আজকের এই কৃষক পরিবারটির হালচাল দেখেও আমার সে অবস্থা।

লিণ্ডাউ (Lindau) জার্মেণী ও অষ্ট্রিয়ার সীমানায়।

পাসপোর্ট ও টাকাপয়সা বদলের ব্যাপারে অনেকক্ষণ থামলো গাড়ী। সকলেই কিছু কিছু মুখে পুরছে,—অন্ততো একটা চকোলেট তো বটেই।

বুড়ী হঠাৎ আমার সামনে এসে দাঁড়ালে। কি ব্যাপার? না, "মুখ দেখে মনে হচ্ছে খিদে পেয়েছে; তাই অল্প পানীয় নিয়ে এলাম।" লালচে পানীয় তখনও ফেনা তুলছে গ্লাসে। ভাষা বুঝিনা, বলতেও পারিনা; ইংরেজীতেই বললাম—"ধন্যবাদ। ভারতীয় মেয়েরা ড্রিঙ্ক করেনা।" সামনের বেঞ্চিতে বসা মেয়েটি সে কথার তর্জমা বুঝিয়ে দিল। গ্লাস হাতেই বুড়ীর দু'চোখ ছানাবড়া!

"এ্যাঁ, এ বলে কি। মদ খায় না?"

"ভারতীয় মেয়ে মদ খায় না. জল খায়; না হলে দই-দুধ খায়।"

ফিরে গেল মাথা নেড়ে। এবার বের করলে এপ্রিকট, বললে এ খাও। বুড়ীর হাত ময়লা বৈকি; কোথায় ধুই সে ফল? কেটে খেতে পারি নেহাৎ। বুঝতে পেরে ছুরি বের করে দিলে এক গাল হেসে। ওর চোখে আমি বিস্ময় হলেও, কোথায় যেন ছুঁয়ে যাচ্ছিলাম তার অন্তর; ছেলে যেমন ছুঁয়ে যায় মায়ের ভেতরটুকু মায়েরই অজান্তে। স্নেহ আছে ঐ রেখা-পরা চোখে; যেন টলমলে জল। এবার হাত বাড়াতেই হলো।

সামনে বসা অষ্ট্রিয়ান মেয়েটি দোভাষীর কাজ করছে।

বুড়োর মুখে কৌতুক তো আর ধরে না সব বিষয় জেনে।

জুরিখের কাছাকাছি হু'টো স্টেশনে বুড়ীকে খুব উদ্বিগ্ন দেখা গেল পোট্‌লা-পুট্‌লি নিয়ে। জানলায় ভীড়, তাই আমার কাছে এলো, বলে "জানলায় একটু মুখ বাড়াতে দাও।"

কাগজে বাঁধা খাবারের ঠোঙা ছুঁড়ে দিলে স্টেশনে. অবোধ্য ভাষায় হাত-পা নাড়া হলো হু'দিক থেকেই।

—"আমার দূর সম্পর্কের ভাইঝি-জামাই, খাবার দিলাম।" —জানলা থেকে মুখ ফিরিয়ে বলে।

পরের স্টেশনে সেই একই অবস্থা। এবার ওদিককার জানলায় হু'জনের পিঠের মাঝামাঝি ফাঁকে মাথা গলিয়ে কথা বলছে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো কারো সঙ্গে : জোর গলা!

গাড়ী ছেড়ে দিলো আগেকার মতো।—"দেখনি? আমার মেয়ে এসেছিল গো দেখতে। খাবার দিয়ে দিলাম! নাতিটি বেশ সুন্দর, দেখলে না! আহা—"

বুড়ীর চীৎকারের ধরণে অনেকেই বিরক্ত হলেন কিন্তু আমার কাছে এর চেয়ে মিঠে পরিবেশ আর কি হতে পারে! বাংলা দেশের গেঁয়ো ঘরে যে স্নেহকোমল কোল আছে স্নিগ্ধ ও অকৃত্রিম তা। তথাকথিত অতি ভদ্র ও শিক্ষিত নামের আড়ালে দেখি কৃত্রিমতার আবিল ভাব! মদের গ্লাস আর এপ্রিকট অথবা কাগজে বাঁধা খাবার স্টেশনে ছোঁড়া তাদের কাছে কৃষ্টিহীনতার লক্ষণ! পালিশকরা মনে সে স্নেহ-

নির্ঝরের স্থান কোথায়! সামনের মেয়েটি যাকে দেখে কুণ্ঠিহীন বলে লজ্জারাঙা হলো সে-ই আঁচড় কেটে রেখে গেলো বিদেশী আমি, আমার মনে। কেন? দিদিমা, ঠাকুরমা যে বাংলা দেশের দই সন্দেশ! এ সম্পর্ক আর কোন্ দেশে মেলে গো!

জুরিখে নেমে গেল দু'জনেই।

ছয়

লণ্ডন !

"পিকাডেলী সার্কাস" ও "অক্সফোর্ড সার্কাসে"র চোখ ধাঁধানো রূপকেই সত্যিকারের সৌন্দর্য ও সমাজের মানদণ্ড মনে করে ধুঁকছে আবার তারই পীড়নে। কালো কালো পাথরের দেয়াল ডিঙ্গিয়ে প্রাণের সবুজ আলো তাই পৌঁছুতে পারে না ঘরে ঘরে। সরীসৃপের দেহের মত মসৃণ তার ওপোরের আবরণ। ময়দানের নীলাভ গ্যাসের আলোর নীচে অন্ধকারের নেশায় পথ ভোলানো রূপ লণ্ডনের।

ক্ষুদ্র পতঙ্গের ন্যায় অসহায় রূপহীনা জিনেট সেখানে। কালো রং, বড় দু'টি কালো চোখ, দীর্ঘাঙ্গী—জিনেট। কোথাও এক ফোটা লাবণ্য নেই ওর সারাদেহে। ক্লান্তিতে মলিন চোখের কোল।

মা আইরিশ, বাবা খাঁটি আফ্রিকান, জিনেটের চেহারা বাবার দিকটাকেই বেশী নিয়ে নিয়েছে। শুধু আদলটুকুতে আইরিশ ছাপ। পানামা অঞ্চলের অধিবাসী সে। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মত পানামাও বিভিন্ন জাতির মিশ্রণে কিছুটা পাঁচমিশালী জীবন ও কৃষ্টি নিয়ে গড়ে উঠেছে।

দিন দুয়েক পর। খেতে বসেছি সকলে। জিনেটের কর্কশ গলায় দাঁতে চেপে রাখা ইংরেজী বড় বেসুরো ঠেকছে কানে।

অতি কায়দা করা ভদ্র ভাব আরও বিরক্তিকর, নিঃশ্বাস বন্ধ বাখার মত অনুভূতি জাগে। ইংরেজী বলে আমেরিকান টোনে। প্রতি মিনিটে মিনিটে "থ্যাঙ্ক ইউ সো মাস্"—সত্যিই অসহ্য। সিগারেটের ধোয়ায় বিবর্ণ কুৎসিত ওর হাতের আঙ্গুল গুলো।

সহজ করে আনি গম্ভীর পরিবেশ গল্প স্বুরু করে। সকাল বেলা "কেণ্টে" গিয়েছিলাম মেয়েদের এক কলেজ দেখতে। ম্যাপ ছিল মাত্র, পুলিশ সঙ্গে কবে বাসে তুলে দিলে। কণ্ডাক্টরকে ঠিকানা দিয়ে বলে দিয়েছিলো "ঠিক জায়গায় নামিয়ে দিযো।"

"পুলিশম্যানও আমায় পথ বলে দেয় না।" তীব্র গলায় বলে ওঠে জিনেট। বলার সঙ্গেই স্বুরু হয় কাশি। সকলেই ভুরু কোঁচকায়। কালো রং-এর উপরে লিপষ্টিকে অতি বেমানান দেখাচ্ছে ওকে। লালিত্যহীন চেহারা ও অতি ধোপ তুরস্ত আবরণের মধ্য দিয়েও যেন কেমন একটা তুঃখের রেশ ধরা পড়ে যায়। জিনেট কখনো স্বাভাবিক মেয়ে নয়। প্রথম থেকে একটা সন্দেহ মনে উঁকি দিলো।

মাঝখানে একদিন তু'টো ফায়ারই খারাপ হয়ে গেল আমার কামরায়। হাত পা জমে আসা ঠাণ্ডা, যেতেই হলো পাশের ঘরে, জিনেটের কাছে।

হলুদ রংয়ের একটা ফ্রক খুলে কি ভাবছে কে জানে। আমাকে দেখে একটু অপ্রস্তুত হলো।

"ফ্রকটি বড় প্রিয় আমার।" আবহাওয়া সহজ করে নিলে। ফ্যাকাসে শরীরে হলুদ যে কী বে মানান সে কথাটি না বললেও ভেবে দুঃখ পেলাম নিজেই।

বড় বড় নকল মুক্তোর একছড়া শাদা মালা সব সময়েই ওর গলায় ঝুলতে দেখেছি। আজ টেবিলেই দেখলাম সে মালা। "সুন্দর মুক্তো।"—প্রশংসামুখর হয়ে উঠি। হঠাৎ উঠে আমাকেই পরিয়ে দিলে সে মালা। পুরানো জমানো চিঠির খাম থেকে পানামার সুন্দর সব কটি টিকিটই পরম যত্নে কেটে আমায় দিলে। ফায়ারটি সরিয়ে আমার মুখোমুখি রাখলে। স্বরে ওর যত্নের দাবী।

"ও মালা আমি গলা থেকে খুলি না।"

"খুব দামী বুঝি? তোমাকে কিন্তু শাদা রঙে মানায় ভালো—" এক ঝলক রক্ত উঠে মুখখানাকে ঈষৎ বেগুনী দেখালো। কাশিতে গলার শিরে টান হয়ে এলো।

"এ আমার জন্মদিনে পাওয়া উপহার, ঐ পোষাকটিও নিজে বাছাই করে এনেছিলাম দোকান থেকে। আমার ভারতীয় বন্ধুর দেওয়া। ওদের মস্তো ব্যবসা পানামায়।"

গল্প জমে ওঠে।

"পানামায় বুঝি অনেক ভারতীয়?"

"অনে-ক। সকলেই প্রায় ব্যব্সাদার বড়লোক। আমার বন্ধুর তো পাথর, মুক্তো আর কাপড়ের ব্যবসা।"

ভারতীয় কৃষ্টি ইত্যাদি নিয়ে কথা হলো অনেক। আমাদের

সমাজ ব্যবস্থা, পারিবারিক জীবন, বিশেষ করে বিবাহপ্রথা সম্বন্ধে ওর কৌতূহল প্রচুর।

সে দিন একটু দেরী হয়ে গেল আমার। ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই খেতে যাওয়া বাড়ীর নিয়ম। "দুঃখিত"—বলে বসতে যাচ্ছি; অনুভব করলাম অস্বাভাবিক গম্ভীর সকলেই। মিঃ ওয়ার্ডের আইরিশ উচ্চারণ আর মিউরিয়েলের পশ্চিম ভারতীয় দোলানো ইংরেজী জোরে না বললে বোঝাও শক্ত। ওরা দু'জনে অতি আস্তে কথা বলছে।

"থ্যাঙ্ক ইউ সো মাস্—" খন খন করে বেজে উঠলো জিনেটের গলা। খাবারের থালাটা হাত বাড়িয়ে নিলে অতি অভদ্র ভাবে।

ভয় হলো দেখে! খ্যাপার মত দুই চোখ তার। আচরণে অসঙ্গত ভাব। ঝক্‌মকে সিল্কের রুমালে ঢাকা মাথা। ঢেউ খেলানো চুল সামনের দিকটায়। গলাটি ভরে আছে এক রাশ মুক্তোতে। শাদা পাথর কানে। রুক্ষ্ম কালো চামড়ার উপর পাউডারের ছোপ, ছাইয়ের মত ভেসে উঠেছে। ফাটা ঠোঁটে লাল রং;—বিকৃত দেখাচ্ছে!

জলের জাগ্‌টি বাড়িয়ে বলি "জল দেবো কি?" ঠিক তেমনি কর্কশ হয়েই জবাব দিলে "নো, থ্যাঙ্ক্ ইউ সো মাস্।" চাপা বিরক্তিতে লাল হয়ে উঠেছে সকলের মুখ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জিনেট বারবার তাকাচ্ছে পাশের চেয়ারে বসা মিঃ ওয়ার্ডের দিকে। বাংলা ভাষায় সহজ করে বলা যায়—"যেন গিলে খাবে।"

কফি না নিয়েই উঠে গেল। ইংরেজ সমাজে নিজের ভাব-প্রবণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া অত্যন্ত অভদ্রতা।

মিউরিয়েল আড়ালে ডেকে বললে—"তুমি একবার যাও ওর ঘরে। মনে হয় বড় অসুখী হয়ে আছে।"

—"আমিও ভেবেছি সে কথা মিউরিয়েল। কিন্তু তুমি গেলে ভাল হয়। তোমার অভিজ্ঞতা আছে—"

বন্ধ দরজায় আঘাত করেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। চুপ থাকাই ভাল মনে করে সকলে নিজ নিজ ঘরে চলে গেল।

পরদিন। ভোরেই দেখি জিনেটের ঘর খোলা। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে গোছানো জিনিষ-পত্তর ;—শুধু নীচে যাবার অপেক্ষা।

ব্রেকফাস্টেও এলো না সে। গৃহকর্তা বেশ উত্তেজিত। নোটিশ না দিয়ে চলে যাওয়া তিনি বরদাস্ত করতে পারছেন না। এতে তার ক্ষতি হলো বৈকি! গৃহকর্ত্রী গম্ভীর—"ওকে চলে যেতে দাও। অত্যন্ত অভদ্র মেয়ে।" আমার মন এসবে সায় দিলো না। সত্য জানার আগ্রহ নিয়ে ওর ঘরে ঢুকি।

ভুল করিনি। কাঁদছে জিনেট!

অহেতুক করুণা ইংরেজের দেশ ও সমাজ বরদাস্ত করতে পারে না। বন্ধুত্বকেও অনেক সময় অহেতুক আখ্যা দেওয়া হয়। ইতস্ততঃ করে তাই একটু সময় নিয়ে ডাকি—"জিনেট! আমি তোমার সত্যি বন্ধু, আমাকে খুলে বল তুমি সব—।"

নাটকীয় ভাবে উঠে বসলো জিনেট। চোখের জলে প্রসাধনের আবরণ এব্ড়ো থেব্ড়ো হয়ে আরও করুণ করে রেখেছে তাকে।

—"ষ্ট্যাব্ (Stab) করতেও ভয় পাই না আমি জানো ?"

মেলোড্রামা মনে হলো বৈকি ! কিন্তু তার অসহায় দৃষ্টির তুলনায় নাটকের অন্য অঙ্গ নেহাৎ তুচ্ছ।

জিনেট আত্মসমর্পন করলে আমার বন্ধুত্বের দাবীর কাছে। এর পরের সবটুকু জিনেটেরই বলা কথার অনুবাদ। ছোট বড়ো নানা ব্যর্থতার আঘাত, মানুষের অবহেলাই জিনেটকে হিংস্র নারীতে পরিণত করেছে।

জিনেটের আশেপাশে যে সমস্ত প্রতিবেশীর সঙ্গে সে বেড়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে "আ—" পরিবারের দোকানটিও বাদ পড়েনি। পানামার যে অঞ্চলে ভারতীয়ের বাস জিনেটের জন্মও সে অঞ্চলেই। বিশেষ করে ঐ পাথর আর মুক্তোর দোকানের উপর তার আকর্ষণ ছিলো ছোট থেকেই। "আ—" পরিবারের বর্তমান পুরুষের সঙ্গে সে সূত্রেই জিনেটের পরিচয়। ঐ হলুদ রংয়ের পোষাকের মত পোষাক বানিয়ে দেওয়া হয়ে দাঁড়ালো তার নিত্য কাজ। পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয় এমনি করেই।

হঠাৎ সে দেশ ছাড়লো। চিকিৎসার দরকার ! কাশিই প্রধান রোগ, ক্রমান্বয়ে বাড়ার দিকেই চললো। সন্দেহ হলো ; থাইসিস্ নয়তো ! টাইপিষ্টের কাজ ছেড়ে সে আটলান্টিক

পার হলো। লণ্ডনে এলো, স্বাস্থ্য ফিরিয়ে নিয়ে কোন কাজে লেগে যাবে এ ইচ্ছে নিয়ে।

হাসপাতালে হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুস পরীক্ষা করা হলো, চিকিৎসাধীনে থাকতেও হলো কিছুদিন। অনুনয় বিনয় করেই ছাড়পত্র নিয়ে বেরিয়ে এসেছে সে। হাসপাতাল থেকে সোজাসুজি এ বাড়ীতেই এসেছে।

—"শরীর ভাল না করে বেরিয়ে এলে কেন? যত্নে ছিলে—"

—"থাকতে পারলাম না। যে সন্দেহ মনে চেপে দেশ ছেড়ে এলাম, সে-ই দিনরাত পেছনে তাড়া করছে। মন ছট্‌ফট্‌ করছে এখানেও।"

জিনেটের ভারতীয় বন্ধু শ্রীযুত্‌ আ—র আচরণে খোলাখুলি যা ধরা পড়েনি, কাগজে কলমে তাই নাকি সে ধরে ফেলেছে। এক চিঠির মারফতে সে উদ্ধার করেছে শ্রীযুত্‌ আ—বিবাহিত এবং এবার দেশে ফিরে গেলে আর আসবে না। জরুরী সে চিঠি, আ—কে ফিরে যেতেই হবে। বন্ধুর এ বিশ্বাসঘাতকতায় মর্মাহত জিনেট। অথচ এ গোপন কথা—খুলেও বলতে পারছে না। প্রমাণ সামনে রাখার উপায় নেই। চিঠি চুরি অপরাধ বৈকি! যাহোক সে বলে এসেছে আ—কে, এখন তাদের অগ্নিপরীক্ষার সময়। জিনেট দেখতে চায় যাচাই করে। যদি আ—র আন্তরিকতা থাকে তবে জিনেটকে ফিরিয়ে নিতে সে আসবেই। এ আশা নিয়েই তার ইংল্যাণ্ড প্রবাস। আজ

বুঝতে পারছে, সে প্রত্যাশা পূরণের সম্ভাবনা কম। ফিরে যাওয়ার জন্য মন আকুল হয়ে আছে ;—না ডাকলে তো যেতে পারে না ? সে যে আত্মঅবমাননারই নামান্তর !

—"মেরে ফেলতেও ভয় পাই না আমি কাউকে, আমাকে কেন সকলে প্রতারণা করবে……?"

জিনেটের অসুন্দর চেহারা হিংস্র হয়ে উঠেছে বুনো পশুর মত।

ভারতীয় জীবনের শান্ত সুষমা এবং ত্যাগের আদর্শ এর জানা নেই। "শেষের কবিতা"র বন্যার মত "পার যদি ভুলিও আমায়, হে বন্ধু বিদায়"—বলার মত সাহস ও তিতিক্ষা নেই জিনেটের। আত্মনাশ ও হত্যামন্ত্রে দীক্ষিত পশ্চিম, আত্মস্থ হবার পথ জানেনি। জিনেটও সে শিক্ষায় শিক্ষিত।

মনে পড়ে গেলো রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকা। ওকে গল্প শোনালাম ভারতীয় আদর্শের ছবি সামনে রেখে, যদি সান্ত্বনা পায় তাতে। যে প্রেম মানুষকে বড় করে, জীবনকে উর্দ্ধলোকের সন্ধান দেয়, সেই—ই আমাদের ভারতীয় জীবনের আদর্শ। বলি তাকে।

জানিনা কতখানি বুঝলো বা মানলো! কলেজের সময় হলো বলে বিদায় নিতে হলো। সারাদিন ওর মলিন মুখখানা জেগে রইলো মনে। ফিরে গিয়ে কি ভাবে ওকে সান্ত্বনা দিতে পারি তৈরী হয়ে নিলাম।

সন্ধ্যেয় খাবার টেবিলে তাকে দেখা গেল না। মিউরিয়েল

জানালে কাউকে বিদায় সম্ভাষণটি পর্যন্ত না জানিয়ে সে চলে গেছে।

মিঃ ওয়ার্ড বললে,—"বেশ হয়েছে গেছে।" "অভদ্র রাষ্টিক !"—সঙ্গে সঙ্গেই বলেন গৃহকর্তা।

পরে আড়ালে ডেকে বললে মিউরিয়েল—মিঃ ওয়ার্ড নাকি চারদিন ধরেই জিনেটের সিগারেট প্রত্যাখ্যান করেছে। কোন্ এক অফিসের ঠিকানাটি পর্যান্ত বলে দিতে অস্বীকার করেছে। রাস্তায় কে নাকি ওকে কথা বলতে দেখে মুখ ফিরিয়ে চলে গেছে, ইত্যাদি। মিউরিয়েল জেনে নিয়েছে এসব কথা।

রূপোপজীবিনা লণ্ডন !! তথাকথিত প্রগতির উত্তাল তরঙ্গে সে সত্যিকারের পথ খুঁজে পাবে কি অদূর ভবিষ্যে ? পানামার কুলে কুলে ও যে ঐ আত্মঘাতী প্রগতিরই ঈশারা ; দেহ-বিলাসের প্রমথ-নৃত্য ;—জিনেটের দলও দোল খাচ্ছে তারই ঢেউয়ে !

—০—

সাত

শ্রীমতী মার্গারিট হোনাওয়াবের বাড়ীখানা জুরিখ হ্রদের কাছেই। মোড় ফিরলেই হলো।

সুইট্জারল্যাণ্ডের পূর্ব অংশের লোক কথা বলে জার্মাণ ভাষায়। হোনাওয়ার পরিবার ঐ অঞ্চলেরই বাসিন্দা। এক লাইন ইংরেজীও বলাব বা বোঝার অভ্যাস নেই তাদের। —"জানো ফ্রয়েলাইন (মিস্), আমেরিকা থেকে আসার পথে একজন জার্মাণ মহিলা কি বলেছিলেন আমাকে? আমেরিকায় এতদিন থেকেও এক মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষা শিখলেন না কেন সে প্রশ্ন করেন একজন তাকে। জবাবে নাকি বলেছিলেন —"আমেরিকা ইষ্ট শ্যোনেচ্ ল্যাণ্ড্, আবের্ হাইমাট্ ইষ্ট হাইমাট্ (আমেরিকা সুন্দর দেশ, কিন্তু নিজের দেশ দুনিয়ার সেরা)।"

অর্থাৎ মার্গারিট জানিয়ে দিলেন কাহিনীটি জার্মাণ মেয়ের হলেও তার সম্বন্ধেও খাটে। নিজের যা কিছু আছে, তা নিয়েই গর্ব, ও আনন্দ। অন্য দেশের ভাষা জানেন না বলে একফোটা দুঃখ বা লজ্জাবোধ নেই।

ইউরোপের মেয়েরা শুধু চেপে ও মেপে হাসেন ;—কে বলে সেকথা? প্যারীর হাসিটি—নেহাৎ দাঁতের সৌন্দর্য্য দেখাবার কায়দা বলেই বেচারী নারীরা ঐ কাজটি করেন! দু'পাটি

দাঁতই একফালি একাদশীর চাঁদের মতো দেখা দিয়ে ফস্ করে লুকিয়ে গেল লালঠোঁটরূপী রাহুর গহ্বরে! এই যেমন কুকুর মাছি ধরে টুক করে আর গিলে ফেলে! মার্গারিট্ মোটেই নন ও জাতের। তিনি একেবারে পূর্ণচাঁদ!

বাপস্, সে কি হাসি জড়িয়ে ধরে! যেন কতোদিনকার জানা শোনা! হোনাওয়ার পরিবারে আমার জন্ম হলে যেমন কিচ্ছুটি বেমানান হতো না, তেমনি শ্রীমতী হোনাওয়ার হাওড়া অথবা শেয়ালদা ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে ঐ ভাবে কাউকে নববর্ষের আলিঙ্গন করে যদি অথৈ হাসতেন তাও বেমানান হতো না বোধ হয়। বাঙালী ঘরের একটি নিটোল চেহারা ভিন্‌দেশের মাটিতে দেখে সে কথাই মনে এলো।

জীবন্ত মেয়ে। সমস্ত বাড়ীখানাকে মাতিয়ে দুম্‌দাম্ শব্দে ওপোর নীচ্ করলেন বারকয়েক খুশীতে। তারপর এক রাশ আঙুর এনে হাজির করলেন। তাও না ধুয়েই।—"টক্‌টার, টক্‌টার,"—অর্থাৎ হে কন্যা, তোমারি জন্যে!

পরিচয় এঁর বাবার সঙ্গে, আমেরিকা যাবার পথে।

চারতলা বাড়ী। নানাজাতের ভাড়াটে আছে। ভারতীয়ও কয়েকজন। নোংরা চারিদিক। এলোমেলো বিছানা-পত্তর। হেন জিনিষ নেই দুনিয়ায়, যা শ্রীমতী হোনাওয়ার শোবার ঘরে রাখেননি! সাবেকী আমলের বনেদী বাড়ীর মতো ঠাসা পুরানো আসবাবে। কাগজের ফুল থেকে স্থুরু করে সেকালের আয়নার চাকনি পর্যন্ত।

"থেকে যাও আমার কাছে দিন পনেরো। আমার ঘরে থাকবে। গাড়ী আছে, প্রত্যেকদিন নিয়ে যাবো লেক্‌এ, স্নান করবে, বোটিং শেখাবো।"

আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম মনে মনে। এরকম দুর্দান্ত স্নেহের আওতায় থাকা?

"দেখিতো সব আগে!" মার্গারিটের প্রশ্নকে সরিয়ে রাখা গেল কোনমতে।

সহর দেখাতে নেবেন। ঊর্দ্ধশ্বাসে নেমে গেলেন নীচে। উত্তেজনায় গাড়ীর "ষ্টার্ট" খারাপ করে মিনিট কয়েক ঠেলাঠেলি চললো। দু'একজনকে ডাকাও হলো রাস্তা থেকে।

"চল দেখি, হেরকে ডেকে আনি।"

"হ্যাচড়ে নিয়ে চললেন। তর্‌তর্‌ করে কি যে বলছেন বুঝতে পারছিনা। শুধু "আইন্‌ মোমেন্ত্‌, আইন মোমেন্ত (এক মুহূর্ত)"—শুনতে পাচ্ছি। সুইচ্‌দের কাছে আইন মোমেন্ত যে বাঙালীর মত আধঘণ্টা সেটা অবশ্য বুঝেছি পরে।

মাটির নীচের এক কামরায় শ্রীযুত এক মনে তক্‌তা চিড়ে চলেছেন। একজন কর্মচারী সাহায্য করছে। শান্ত, নিতান্ত শাদামাটা গোছের মানুষ। তিনিও গাড়ীতে হাত লাগালেন। ষ্টার্ট নিলো গাড়ী।

জুরিখ হ্রদের বুকে অসংখ্য বোট;—মোটর বোট, পাল-তোলা বোট, সারি সারি সাজানো। পিট্‌পিটে বৃষ্টি ও খারাপ আবহাওয়ার জন্য জলে নামা হলো না।

গাড়ী রেখে পায়ে হেঁটে চললেন। শাড়ী পরে চলা ইউরোপের পথে এক ঝক্‌মারি। অস্বাভাবিক বা নূতন কিছু হলে একে অন্যকে যেমন ঈঙ্গিত করে দেখায়, এখানকার লোকেরাও তাই করে। অনেক সময়ে মাত্রা বেশীও হয়ে দাঁড়ায়। আমার শাড়ী সকলের দৃষ্টিতে আসছে মার্গারিটের তাতেই যেন গর্ব। শাড়ী তিনি সইতে পারেন বেশ, পারেন না শুধু ফরাসী মেয়েদের অতি উৎকট রকমের আধুনিক সাজসজ্জা। ছুঁচলো লাঠি হাতে, পালকের পাখা ওড়ানো গোছের টুপিতে, শরীরের নীচু অংশে অতি চাপা স্কার্ট (মাঝে মাঝে গায়ে এঁটে থাকা পায়জামা) আবার ওপোরের অংশে বিচিত্র ফাঁপানো কোট, অতি হাইহিল, চক্‌চকে জুতো, বাঁ হাতে সিগ্‌রেট, কায়দা করা ব্যাগ হাতে,—এরা যে কি, মার্গারেট নাকি তা ঠিক বোঝাতে পাবেন না!

কানের কাছে মুখ এনে বলেন—"ওরা এসেই আমাদের দেশটিকে নষ্ট করেছে বুঝলে? শুধু বিলাসিতা। যত রাজ্যের পারফিউম্‌ আর চটকদার পোষাক! তোমাদের ভারতীয় ছেলেগুলো এন্তার্‌ ঘুরে বেড়ায় এদেরই সঙ্গে।"

মার্গারিট এবার হাত দিয়ে দেখিয়ে দিতে সুরু করলেন কোন কোনটি ফরাসী মেয়ে। ভাবখানা যেন সাবধান এদের সম্বন্ধে —।

"টেক্‌নিক্যাল হোক্‌গুলের"—এক বিখ্যাত অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় নির্দিষ্ট ছিল। মার্গারিটের

"আইন মোমেন্ত্" শেষটায় সময়ের এত হেরফের করে দিলে যে, বাবা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন। কি আসে যায় তাতে!—"বা-আ-বা (বাবা), বা-আ-বা,—আইন মোমেন্ত্ বলেই চলেন। মার্গারিটের নির্বিকার চেহারা দেখে শেষে হাসি চাপা দায়।

পরদিন ওদের বাড়ীতে খাবার নিমন্ত্রণ। রান্না হবে ভারতীয় পদ্ধতিতে।

বেলা তিনটায় বের হয়ে সন্ধ্যা অবধি দোকান আব পছন্দ হয় না। পাহাড়ের গা ঘেষে, সরু সরু গলি পেরিয়ে এখান থেকে ওখানে ঘুরে ঘুবে শেষে এক দোকান পছন্দ হলো। "ট্রাউট্" মাছ তাজা পাওয়া গেল। জীবন্ত মাছ কাঁচের বাক্সে অক্সিজেন দিয়ে জলে বেখে দেওয়া হয়। প্রয়োজন মত মেরে ওজন করে দেয় দোকানীরা। ট্রাউট, ফুলকপি ও আলু কিনে ঘরে ফেরা গেল।

বাড়ীতে ঢোকে সাধ্যি কার? দুটো কুকুরই অতি উগ্র। মার্গারিটকে দেখে যে ভাবে ছুটে এলো, কামড়ে না দেয়। সে দুটোকে আদর করার সে কি উচ্ছ্বাস। একটিকে বেঁধে না রেখে ঘরেই ঢোকাই গেল না। উৎকট হৈচৈতে মস্তিষ্ক আমাদেরও উষ্ণ।

এবার রান্নাঘর। ভাঁড়ারের মত জিনিষ পত্তরে ঠাসাঠাসি সে ঘর। সকাল বেলাকার রান্না করা বাসি ভাত, ডিমের খোসা, আধোয়া বাসন কোসন ছড়ানো। নোংরা পরিবেশ।

ভালো বিপদ! রান্না করবো না মিনিটে মিনিটে মুখ তুলে নবাগতদের দেখবো! শ্রীমতী এক এক জনকে নিয়ে আসেন, কাপড় দেখেন. হাতের বালা ঘোরান, মাথার চুল, গলার হার দেখেন। হোনাওয়ারের হাত নাড়ার ভঙ্গী, গম্ভীর মুখ ও বড় বড় চোখ করে দর্শকদের বলা—"শ্যোন্, ঝিয়ার শ্যোন্—(বড় সুন্দর)"—দেখে শুনে যে হাসি চাপতে পারে তাকে এক তুলনা করা যায় কচি সংসদের "কেষ্ট" চরিত্রের সঙ্গে! উনুনের উপর সস্‌পেনে তরকারী হচ্ছে, প্রত্যেককেই ঢাকা খুলে দেখাচ্ছেন, একবার করে শুকে তারাও বলছেন—"শ্যোন, শ্যোন্!"

তৃতীয় পর্ব আরও চমৎকার—

রান্নার আয়োজন চার জনের, চেয়ার পাতা হলো আট জনের! ভারতীয় রান্না চেখে দেখবেন বলেই ডেকে এনেছেন নাকি আরও চার জনকে। অথচ সেকথা জানাননি কাউকেই। যাহোক! চাখছেন সকলেই আর বলছেন—"শ্যোন্, শ্যোন্।" খাবো কি আর! একদিকে ক্ষুধার যন্ত্রনা অন্যদিকে পেট কামড়ানো হাসি; ভদ্রতায় তাকে চেপে রাখা! সে এক অবস্থা বটে!

শ্রীযুত চুপচাপ।

খাওয়া পর্ব শেষে আমোদের পালা। হারমোনিকা নিয়ে বসলেন শ্রীযুত। শ্রীমতী সহ ডুয়েটে গাইলেন।

গলায় ছোট একটি ঘণ্টা বাঁধা চীনে মাটির একটি গরু (পুতুল) উপহার দিলেন। মুখের ঢাকা খুলে তাতে জল ভরে

আবার কেট্‌লির ধরণে পুতুলের মুখ দিয়ে বার করা ইত্যাদি নানা উপায়ে বুঝিয়ে বললেন—"দুধ খাবে এটাতে করে, আর আমাকে মনে রাখবে। আমাদের দেশ দুধের দেশ—এটা তারই স্মৃতি হয়ে থাক।"

—"আমি কি ছেলেমানুষ ?

—"ছেলে মানুষ বৈকি ! নিশ্চয়ই। তুমি আমার মেয়ে।"

হাজার হোক বাঙ্‌লার মাটীতে জন্মেছি তো। মা নাম আর মেয়ে সম্বন্ধ হলেই চুপটি মেরে যায় মুখ। দু'খানা রুমাল, নিজের একটি ফটো দিয়ে, ঐ বৃষ্টির মধ্যে ফোন করে ট্যাক্সি আনিয়ে বিদায় দিলেন—"আউ ভিডার ঝ্যেন্ (বিদায়।)"

সন্ধ্যার আলোয়, ঝড়ের রাতে মার্গারিটার মুখখানাকে করুণ মনে হলো। ঝাপসা তার চোখের আমেজ। ভেতরে যে দরদী মন রয়েছে মায়ের, শুধু দুটি কুকুর পুষে তার শান্তি মেলে কৈ ? দুরন্ত আবেগ অথচ আত্মভোলা স্বভাবের ভেতর দিয়ে ঐ কথাই তো বুঝিয়ে দিলেন, ভেতরের জগতে শূন্যতা তার অনেক।

হোটেলে পৌঁছে পয়সা দিতে যাই ট্যাক্সি ড্রাইভারকে।

—"পয়সা তো দেওয়া হয়ে গেছে। গুটে নাক্ট (গুড নাইট)।"—উত্তরের অপেক্ষা না রেখে সে ষ্টার্ট দিলে।

জুরিখের কালো পিচ্ ঢালা মসৃণ বৃষ্টিধোয়া রাস্তায় বিজলীর আলো যেন জলছবি বানিয়েছে। ঐ জলছবিতে মার্গারিটের আপনাকে লুকিয়ে রাখা মনের ঈশারা !

এ মেয়েটিকে বাঙলা দেশের কোলে দেখলে ভিনদেশের মনে করবেন কি কেউ ?

আট

ভদ্রমহিলা নজরে পড়ে গেলেন।

সারাটি রাত নেচে কুঁদে হয়রান। জাহাজের ওপোরের ডেক্‌এ দশটার পর উদ্দামতা সুরু হয়। কৌতুহলী হয়ে ভারতীয় ছেলেমেয়েরা (বিলেত ঘুরেও অতি-আধুনিক হতে পারেননি যাঁরা) একটুখানি নাক গলিয়ে দেখে আসেন। অন্যদল ঘুর ঘুর করেন। একদিকে ইচ্ছে অন্যদিকে দেশের ও সমাজের কথা ভেবে যাঁরা না ঘরের, না বাইরের হয়ে থাকেন,—এদলে আছেন তারাই। বান্ধবী জোগাড় করতে পেরেছেন যাঁরা, ভাগ্যবানের সে দল এঁদেরই পানে একটু কৃপা মিশ্রিত দৃষ্টিপাত করেন। ভালুক বা বানর নাচের ড়ুগড়ুগি শুনলে যেমন ছোটে কৌতুহলী ছেলেমেয়েদের দল বাকীদের অবস্থা সে রকম।

—"নাচবে তুমি ?" পিঠে নরম একটি হাত পড়ে।

—"আমি তো নাচি না। যে সমাজের মেয়ে আমি, সেখানে এসবের জায়গা নেই। কোন কাজে আসবে না এ নাচ।"—জবাব দিই।

—"শিখলে ক্ষতি কি ? ছোটবেলা থেকেই নাচতে আমি ভীষণ ভালবাসি। এখন ঠিক আগের মত হৈ—হুল্লোড় ভাল লাগে না।"

—"নাম জানতে পারি কি ?"

—"মিসেস রবিনসন।"

পরদিন। চারটের পর চা-ঘরে গিয়ে দেখি, সকলেই আগে ভাগে এসে জায়গা নিয়ে নিয়েছেন। সবকটি চেয়ারই প্রায় দখলে। এক কোনে সেই মহিলা বসে আছেন। হাত দিয়ে ঈশারায় ডাকলেন। দু এক কথার পর বললেন ;—

—"গান্ধীজীর দেশ থেকে আসছো। শুনলাম তোমার বাবা গান্ধীজীর সহকর্মী—শিষ্য। আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবে কি ? গান্ধী আমাদের জীবনের আদর্শ।"

বলেই দু'হাত প্রণামের ভঙ্গীতে কপালে ছোঁয়ান। পাশেই বসেছেন এক গোয়ানীজ পাদ্রী। রুক্ষ চেহারা। বিনা ভূমিকাতেই মন্তব্য করেন—গান্ধীবাদ ও ভারতীয় ভাবধারা বলে বর্ত্তমানে ভারতে কিছুই নাই। জাতিভেদ প্রথা আছে। শাসন ব্যবস্থায় প্রচুর গলদ। মহাত্মাজী সম্বন্ধে তার যথেষ্ট সন্দেহ······ইত্যাদি ইত্যাদি কথা বলে গেলেন এক নিঃশ্বাসে। তার মতে—ভারতকে বিশৃঙ্খলার হাত থেকে বাঁচাতে পারে একমাত্র যীশুর মত ও পথ আর পর্তুগীজ শাসন পদ্ধতি ! রবিনসন মুখ টিপে হাসলেন। বললেন—

—"শাদা জাত তোমাদের মুল্লুকে কি অব্যবস্থা করেছে জানি কিছু কিছু। অষ্ট্রেলিয়ান হলেও ইংরেজ রক্ত আমার গায়ে। ভারতের দুর্গতির খবর রাখি। শাদা চামড়া আমারও এবং তার মিথ্যে অহমিকা যে কী জিনিষ সেও জানা আছে।"

পাদ্রী আবার মাথা তোলেন। বলেন—"পতুগালে দেখে এলাম, কি সুন্দর সব ব্যবস্থা! কি আছে ভারতে···।"

প্রতিবাদ করি।

—"পরপদ লেহনের জন্য এক বিশেষ শ্রেণী আছেন ভারতে, ইংরেজ আমলেও ছিলেন।"

—"তাদের কোন দেশই কোনকালে শ্রদ্ধা করবে না—" বলেন রবিনসন।

জবাবে বলি—"হল্যাণ্ডে দেখলাম ভারতবাসী প্রাণপণে বোঝাচ্ছেন যে পৃথিবীতে সেরা দেশ সেটিই। ডেনিস মেয়েকে পাশে বসিয়ে চলন্ত ট্রামের মধ্যে বাঙালী ছেলের সে কী উচ্ছাস অর্থাৎ সেরা দেশ ডেনমার্ক। জার্মাণীতে শুনলাম্—ড্যাম্ ইওর ইংলিস—দেশ এই জার্মাণী! লণ্ডনের ভারতীয় ছাত্রাবাসে অর্ধনিমীলিত আঁখি ও নেঁকু থিয়েটারী সুরে ইংরেজ মেয়ের স্তুতি "ওয়াণ্ডারফুল" এখনো চোখে ভাসছে! আর রুশিয়া যে দ্বিতীয় স্বর্গ, সে শ্লোগান তো দুর্ভাগা দেশের দিগন্ত মুখরিত করছে আজকাল।"

পাদ্রী সাহেবের কপাল কুঁচকে উঠেছে। না থেমে বলি—"একটি ডেনিস ছেলে বলেছিল কোপেনহাগেন যাবার পথে—দু'মাস ভারতে থেকে সে নাকি একটি দিনও কোন ভারত-বাসীকে দেশের তৈরী জিনিষ নিয়ে গর্ব করতে দেখেনি! "শেম্" কথাটি বলতে সে একটুও দ্বিধা করেনি। চীনের দৃষ্টান্ত দেখাতেও ভোলেনি। জাতীয়তা বোধের অভাব

সেকথাটিও স্পষ্ট বলেছিল। অতএব আপনার কাছে যদি পর্তুগাল স্বর্গাদপি গরিয়সী হয়; তাতেও আশ্চর্য হবার কিচ্ছুটি নেই—।"

আমাদের দল ভারী। পাদ্রী মশায় একা। এগুতে আর সাহস পেলেন না। লিক্‌লিকে শরীর নিয়ে ডনকুইক্‌জোটের বর্শাই শুধু উঠালেন, দৈত্য বধ আর হলোনা।

—"শাদা জাতের সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স বড় বেশী।"—আবহাওয়ার গতি ফেরাতে চেষ্টা কবেন রবিনসন।

ওদের সুপিরিয়রিটি না আমাদের ইনফিরিয়রিটি—সে মীমাংসা করে কে? তবুও বলি—"শুধু শাদা চামড়ার দৌলতে তোমরা পৃথিবীকে পায়ের নীচে রাখতে চেয়েছিলে। সরল মানুষ পূবদিকের। রং দেখে হক্‌চকিয়ে গিয়েছিল। আজ বুঝতে পেরে চারদিকেই সামাল সামাল রব। ইংরেজের কাছে ভারতীয় ছিল নেটিভ। প্রমোদ লীলার জন্য কত প্রাসাদই না গড়েছিল এই নেটিভেরই পরিশ্রম ও অর্থে। অথচ বুটের গুঁতো পেয়েছিল পরিবর্তে। "ডগ্‌জ্‌ এ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ানস্‌ আর নট্‌ এলাউড্‌"—সে ব্যবহার কি ভুলতে পেরেছে ভারতবাসী?

—"ঠিক সে দলের এ্যারিষ্টোক্র্যাট্‌ আমার বাবা। আড়ম্বর, আত্মসুখ ও ভোগ। মিথ্যে অহঙ্কারে শাদা কালোর ভেদ ভুলতে পারেন না এখনো। বোঝেন যদিও।"

—"ইংল্যাণ্ডে আলাপ হলো অনেকের সঙ্গে। এরাই একদিন ভারতে ছিলেন নবাবী চালে! শুধু রংয়ের জোরে।

আজ ঘর-বাড়ী পরিষ্কার করার কাজ করে অন্ন সংস্থান হচ্ছে। সুযোগ পেলে তারা ফিরে আসেন ভারতে আজও। কিন্তু চাকা ঘুরে গেছে—!"

কথা পেড়েই চলেছে। মনে হল বড় পুরানো ওসব কথা। কে ভালো, কে মন্দ আর শুধু অতীতের কলকাঠি নাড়া এখন বাগাড়ম্বর। হয়ত অন্যের পক্ষে এসব কথা আঘাতেরই মত ঠেকছে। সামুদ্রিক খুশীব মৌতাতে ওসব ভালো লাগলো না। কেটে পড়ি। মহিলা পাকড়াও করেন আবার লাউঞ্জে। বুঝলাম স্নব্ নন্। জিজ্ঞাসা তার আন্তরিক। স্বজাতির সমালোচনা তিনি সুস্থভাবেই নিতে পারেন।

সেদিন বারোটার পর। প্রথম দলের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় দল গেছে খাবার ঘরে। লাউঞ্জ খালি। পিয়ানোটি খোলা আছে। বাংলা গান পিয়ানোতে বেশ খাপ খায় একটু "বিট্" দিয়ে বাজালে। রবীন্দ্রনাথের "সঙ্কোচের বিহ্বলতা" এবং "খরবায়ু বয় বেগে" গান দুটো ভালই লাগে শুনতে। চুপচাপ বসে বাজাচ্ছি। কখন যে অনেকে এসে বসেছেন খেয়াল করিনি। রবিনসন পাশে বসলেন।— "সেই গানটি আবার বাজাও তো।" "খরবায়ু বয় বেগে" গানটির সঙ্গে তিনি লা লা করে সুর মেলালেন। জমে উঠেছে বেশ। এমন সময় লাউঞ্জ ষ্টুয়ার্ড এসে বললে—"এখন বাজিও না, সকলের বিশ্রামের সময়।"

—"কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন নোটিশ তো দে'য়া হয়নি

জাহাজের কোথাও। পিয়ানোর চাবিই বা খোলা কেন? যদি নিয়ম থাকে তবে সে রকম ব্যবস্থা হয়নি কেন?"

কফি রংয়ের ভারতীয়ের (আজকাল কাল বলা হয় না, ভারতীয়রা coffee coloured এবং আফ্রিকানরাই কালো।) কাছে এ জবাব ষ্টুয়ার্ড আশা করেনি। মুখের ভাবে বোঝা গেল। যাহোক ভারতীয় বন্ধুরা একটু তেতে রইলেন।

পরদিন ঠিক ঐ সময়ে আমরা লাউঞ্জে তাস নিয়ে বসলাম কি হয় দেখার জন্য। এক ইংরেজ মেয়ে দিব্যি সুন্দর বাজিয়ে চলেছে। দুটো, আড়াইটে, তার ওপর হয়ে গেল। ষ্টুয়ার্ড আজ আর তাকে নিষেধ করে না। নেপালী ছেলেটি চট্ করে উঠে বললে—"আমাদের নিষেধ করেছিলে কেন কাল? আজ যে প্রায় তিনটে বেজে গেল। এক্ষুনি মানা কর ওকে বাজাতে, নইলে আমরা রিপোর্ট করবো ক্যাপ্টেনের কাছে।" অন্যেরা প্রস্তুত। শুধু বাম ডান করে পা ফেলার অপেক্ষা! কাঁচু-মাঁচু মুখ ষ্টুয়ার্ড বিনীত ভাবে গিয়ে দাঁড়াল মেয়েটির কাছে।

—"দেখলে তো ব্যবহার! এ ভেদনীতি মানি না বলে আমাদের মেয়েরা আমাকে পছন্দ করে না। সামনে যত কথাই বলুক; আড়ালে এরা কখনো ভোলে না তাদের চামড়াটি শাদা।" একটু জোর দিয়ে বলেন রবিনসন।

—"ঐ কমপ্লেক্স যায়নি বলেই তো সারা দুনিয়ায় মার খাচ্ছে আজ। এশিয়ার সব দেশই এখন শাদা দেখলে আঁৎকে

ওঠে। বিশ্বাস করেও করতে পারে না আর। তাদের কাছে সব শাদা চামড়াই সাম্রাজ্যবাদের অশুভ প্রতিনিধি!"

—"শোনো তবে। আমার নিজের জীবনে যা ঘটেছিল। বুযার যুদ্ধের পরের ঘটনা। স্বামী ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায়, নাটালে। ইংরেজ জাতির গর্বে রক্ত তাঁর উষ্ণ, কালা আদমী তার কাছে অতি নগণ্য জীব। আফ্রিকানদের ঘৃণা করতেন অন্তর দিয়ে, যখন তখন সামান্য কারণেও হাত ট্রিগারে চেপে বসত। একদিন বেড়াতে যাচ্ছি। আমার প্রথম ছেলের তখনও জন্ম হয়নি। অসুস্থ শরীর নিয়ে হাটতে পারছি না জোরে। স্বামী একটু জোর পায়ে হেঁটে সামনে এগিয়েছেন। ছোট একটা গ্রামের গা ঘেষে চলেছি। একটি ছেলে, বছর দশেকের হবে, দৌড়ে এসে সামনে দাঁড়াল। হাত পা ছুঁড়ে কি যেন বললে। বুঝে উঠার আগেই সারা মুখে আমাব থুথু ছড়িয়ে দিয়ে এক ছুটে লুকিয়ে গেল। কালো নিগ্রোর হাতে এ অপমান সেদিন সওয়া শক্ত ব্যাপার ছিল। একবার স্বামীকে বললেই তোলপাড় হয়ে যেতো; ধরে ফেলতেন ঐ ছেলেকে। এক-গুলিই যথেষ্ট ছিল ঐ ছেলেটির পক্ষে! হয়তো গ্রামের দুর্দশা হতো আরও বেশী। চুপ করে গেলাম সব জেনেও। আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে অপমান করেনি, বুঝেছিলাম। শাদা রঙ্ আমার, সে রঙকেই ঘৃণা করেছিল। অন্যায় তো করেনি। ভবিষ্যতের সূচনা দিয়েছিল মাত্র। জানা-শোনা থাকলে আমাকে সে-ই হয়তো বা শ্রদ্ধা করতো সবচেয়ে বেশী। যে

জাতি রঙের মাপকাঠিতে সারা দুনিয়ায় ভেদ সৃষ্টির মলিনতা এনেছে, এর চেয়ে ভাল ব্যবহার সে কি করে আশা করতে পারে বল ?"

যাদু আছে রবিনসনের গলায় ও বলায়।

ভালো লেগে গেল তাকে। মন মিললে বাইরের তফাৎ কিছুই নয় ;—নিশ্চিত ধারণা আমার।

ডেক্ চেয়ারে বসলে বা ঘুমলে যতবার গেছেন সে পথে, মাথায় কপালে হাত বুলিয়েছেন স্নেহে। জানতাম, মাথায় হাত রাখেন শুধু মা জেঠিমারই দল। পনেরো দিনের প্রতিটি দিন যাচাই করে দেখেছি—বাঙালী মা-জেঠিমারই মতো নরম বস্তু আছে তার ভেতরে। ঐ কটিদিনের অবসর সময়ে বসে বসে মালা তৈরী করেছেন আমার কমলা রংয়ের শাড়ীর সঙ্গে ম্যাচ্ করে গলায় পরার জন্যে।

—"তোমাদের মেয়েরা অনেক ডিগনিফাইড্।"

ওধারে বসা মেয়েদের দিকে তাকিয়ে তিনি সমালোচনায় নামেন। অর্ধ উলঙ্গ মেয়েদের আরও উলঙ্গ হবার কী তীব্র বাসনা। বাবা বলতেন—"কৌপীনবস্ত মেয়ে !" দেহ দেখাবার কি নির্লজ্জ প্রয়াস !

—"ওদের দেখে নিজেরই লজ্জা করে। প্রগতি ভাল কিন্তু সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য থাকবে না কেন তাতে ! বুঝলে, এ হলো হাল আমলের ফ্যাসান ! পায়ের গোড়ালি ঢেকে পোষাক না পরলে সমাজে আমাদেরও নিন্দে হতো একদিন। স্বাস্থ্যের

নামে উগ্রতা আর প্যাশান (passion), শুধু দেহবিলাস—এ আমি সমর্থন করি না।”

শুনে হেসে ফেলি সকলেই। এ আর এমন কি? বিলাতী জাহাজে উঠলেই তো চোখে পড়বে প্রায়-উলঙ্গ শ্বেতকায়া নারী, ইজিচেয়ারে এলানো দেহ, আর ছোট পায়জামা পরা এক শ্রেণীর ভারতীয় ছেলে তাদেরই পদপ্রান্তে! পানীয়ের বোতল পাশে, সিগ্রেটের ধোঁয়া উঠ্ছে কুণ্ডলী পাকিয়ে,—কোথায় লাগে বম্বে টকিজ তখন!! সেতো চোখ-সওয়া হয়ে গেছে। অবশ্য বুঝলাম না ঠিক কাকে সমালোচনা করছেন রবিনসন। উলঙ্গ মেয়েদের না পদপ্রান্তে উপবিষ্ট উন্মাদ ভারতীয়দের। নারী পূজা এঁরা বিদেশে গিয়ে করেন সে তো সান্ত্বনার কথা! কটাক্ষ করার মত কি আছে ওতে!

—“আমি বেঁচে গিয়েছি গুরুর সংস্পর্শে এসে। ফরাসী হলেও তিনি ভারতীয় যোগ সম্বন্ধে জ্ঞান রাখেন। আমাকে শিখিয়েছেন যোগ করে মনকে কি ভাবে সংযত রাখা যায়। জাহাজেই কয়েকটি মেয়ে মানসিক বিপর্যয়ে বড় কষ্ট পাচ্ছেন। রোজ সন্ধ্যেবেলায় ওদের কাছে যোগের কথা বলেছি। উপকার পেয়েছে ওরা।”

ঝুলি থেকে বে’র করেন যোগাভ্যাসেরই বই। সেই-ই বই, যা দেখেছিলাম হেলসিঙ্কিতে মিঃ ক্যালিনিনের বাড়ীতে! আশ্চর্য তৎপরতা দেখছি ক্যানাডিয়ানদের—এসব ব্যাপারে। ওদের চোখে আমাদের দেশ মানে সাপের, নয়তো নঙ্গ।

সন্ন্যাসীদের আখড়া! অনেকে ভারতে এসে গঙ্গার পাড়ে নাকি মানুষের মৃতদেহ খোঁজেন। কারণ নিষ্ঠুর ভারতবাসী মানুষ ও পশু মেরে সৎকার না করে গঙ্গার ধারে ফেলে রাখে। সে ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখার কল্পনায় ও নাকি অনেকে এদেশে আসতে ভয় পান! সাবাস—জ্ঞানী আমেরিকা!

—"এসব বই পড়ো না। এতে সত্যিকারের কোন কথাই নেই। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ এদের বই পড়ার জন্য অনুরোধ জানাই। নোট বইয়ে টুকে নিলেন সব নাম গুলোই। এবার ফরাসী গুরুর লেখা—ভারতীয় দর্শন থেকে পড়ে শোনালেন।

ব্ল্যাক্ স্যুট্ ডে,—কি হৈ চৈ। জাহাজ পরদিনই বম্বে পৌঁছাবে। বিদায়-ব্যথা ও আকুলতা নিয়েই—নাকি শেষ নাচ হবে। সমুদ্র বক্ষের বাধাবন্ধনহীন অসামাজিক জীবন শেষ হবে তারপরে। দেখতে গেলাম।

"বি" ডেকের এক কোনায় টেবিল টেনিস খেলার জায়গায় দেখি দূরের বাজনার শব্দ শুনে নাচছেন রবিনসন ও তার এক বান্ধবী। আমাদের দেখে একটু অপ্রস্তুত হলেন।—"বাজনা শুনলে না নেচে পারি না। তবে নাচের আসরে ঐ হট্টগোলে আর যাবো না ঠিক করেছি। সেদিন তোমাকে বলেছিলাম, তারপর থেকে আর নাচতে যাইনি।"

সত্যিই সেই আলাপের পরে একদিনও নাচের মহলে তাকে দেখা যায়নি। সুর আছে ভেতরে বুঝলুম, শুধু কথার

মারপ্যাচ নয়। কয়েক লাইন কবিতা—লিখলেন আমাদের উদ্দেশ করে, উপহার দিলেন বিদায়ের দিন।

অষ্ট্রেলিয়া ফিরে গিয়েও ভুলে যাননি সব। দিন কয়েক হলো একটি অষ্ট্রেলিয়ান পাউণ্ড পাঠিয়েছেন ভারতীয় শিশুদের কল্যানের জন্য যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য স্বরূপ।

পশ্চিম মুখ ফেরাচ্ছে পূবের দিকে। সূর্যেরও এখন উত্তরায়ণ থেকে দক্ষিণায়ণে গতি ফেরাবার পালা! মিসেস্ রবিনসনেরাই স্বাগতঃ জানাচ্ছেন সে দিনকে। রাখী বন্ধনের কাজ এঁদেরই মতো মেয়েদের হাতে!

নয়

ফ্রয়েলাইন রুথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন হের্ "শে—" ন্যুরেনবার্গের কাইজারহপ্ হোটেলে।

"—" কোম্পানী আমাদের তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছে। হের "শে—" তারই ডেপুটি ডিরেক্টর। মেয়েরাই মেয়েদের বুঝতে পারে ভালো করে। তাই রুথকে আনা হয়েছে আমারই জন্যে। কথাটা পরে বুঝেছিলাম অবশ্যি। ইংরেজীও বলতে পারেন—সেও অন্য কারণ।

হাসিখুসি মুখখানা। বয়স নাকি পঁচিশ। অতি বাড়ন্ত গড়ন! লম্বা ও চওড়ায় দীর্ঘদেহ 'শিখ'দেরও হার মানায়! তুলনায় চট্ করে "হাতী" শব্দটিই মনে আসে! ঘন কালো রংয়ের পোষাকে আঁটসাঁট শরীর। তুলনায় আমি শশক গোষ্ঠীয়!

হের অতি চাপা গম্ভীর প্রকৃতির লোক। ফ্যুয়েরারের ব্যক্তিগত সহায়ক ছিলেন। অনেক গোপন তথ্য জানা আছে, গত যুদ্ধের তিনি প্রত্যক্ষ সাক্ষী। মাথায় মস্তো টাক, জীবন মধ্যাহ্ন পেরিয়ে গেছে আমার হিসেবে। প্রয়োজন না বুঝলে একটি কথাও বলেন না।

ব্যাভেরিয়ার মধ্যযুগের কৃষ্টির নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটি পুরাণো বাড়ীঘর এবং ন্যুরেনবার্গের প্রাচীন কেল্লাটি দেখাতে

যে সময়টুকু গেল তারই ভেতর রুথ জানিয়ে দিলেন তার নিজের অনেক গোপন কথাই।

—"তোমার বয়স কত? তোমার ফিঁয়াসে (fiance) নেই?"

প্রথম প্রশ্নেই চমকে উঠলাম। ইংল্যাণ্ডে লেখাপড়া ক'রল'ম কিছুকাল; অজান্তে ওদেরই কায়দা-কানুন কিছুটা আয়ত্বে এসে গিয়েছে। ত্ব'মিনিট আলাপেই যে কেউ চট্ করে বয়স এবং ফিঁয়াসের কথা জিজ্ঞেস করতে পারে! অবস্থাটি বুঝে নিতে একটু সময় লাগলো বৈকি।

বয়স জিজ্ঞেস করাটা জার্মানীতেও অনেকটা বাঙালীদেরই মতো রুচিহীন অভ্যাস। ইংরেজ স্বভাবচাপা জাত, অন্যের সম্বন্ধে অহেতুক কৌতুহল এবং যখন তখন নিজেকে প্রকাশ করার আগ্রহ নিয়ে বিব্রত করে না। ভিনদেশীকে তো নয়ই। কিন্তু ট্রাম কণ্ডাক্টরও অসঙ্কোচে জিজ্ঞেস করতে ভোলে না বয়সের কথা,—বিশেষ করে—জার্মানীর দক্ষিণাংশে।

—"উনি আমার ফিঁয়াসে"—হের কে দেখিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলেন ফ্রয়েলাইন্।

ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশেরও কিছু বেশী, নিজের বয়স পঁচিশ একথাও জানালেন।

—"অতি চমৎকার লোক। একটি মেয়ে আছে তাই কি করবেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। আমি বিয়ে করতে রাজী আছি। উনি আমার ভালবাসার জন।"

ভালবাসা কথাটি ইংরেজীতে মানায় ভাল, পরিবেশ রয়েছে কিনা! একবার হাইড্ পার্ক নয়তো কেন্‌সিংটন গার্ডেন ঘুরে এলেই 'লভ্' কথাটির অর্থ ভালো বোঝা যাবে। কিন্তু বাংলায় অনুবাদ করলে কেমন যেন একটু বোকা বোকা, নাটক নাটক মনে হয়! তা উপায় কি! শব্দ তো ব্যবহারেরই জন্যে!

এবার মুখ খুলি।

—"কিন্তু বয়সে তিনি যে—"

—"না, না, কি আর এমন বেশী! দেখতে ওরকম মনে হয়। তাছাড়া বয়স নিয়ে আমাদের দেশ মাথা ঘামায় না বড় বেশী। দোজবরে কি তোমাদের ওখানে কারও বিয়ে হয় না?"

—"হয়, তবে সাধারণতঃ সকলেই প্রথম বরেই মেয়েদের বিয়ে দিতে চান। কারণ এখনো আমাদের দেশে মা, বাবা বা বয়স্ক ব্যক্তিরাই বরের ব্যবস্থা করেন। নিজের ইচ্ছামতো বিয়ে সকলের হয়ে ওঠে না। সমাজে ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশার তেমন সুযোগ নেই বলে—।"

—"আমাদের ওসব নেই। কাউকে ভাল লাগলেই বিয়ে করতে পারি।' এছাড়াও দেখ,—হের কত বেশী রোজগার করেন মাসে। অত টাকা-পয়সা, বাড়ীঘর, ভাল পোজিসান আছে;— আর কি চাই? শুধু মেয়েটির কথা ভেবেই হের এখনো মন স্থির করতে পারছেন না।"

—"তোমরা—ক' ভাইবোন?"

—"আমি একজনই। হেরকে বিয়ে করায় মা বাবা কারও আপত্তি নেই। আমি তো চাই-ই।"

হেরের মেয়ের বয়স পনেরো। স্ত্রী মারা গেছেন বেশী দিন হয়নি।

—"দেখা শোনা করার একজন না থাকলে কি চলে? মেয়েটি পড়াশুনা নিয়ে থাকে। বাড়ীতে বিশৃঙ্খলা এসে গিয়েছে—" রুথ চলে যায়।

ন্যুরেনবার্গের খোলা মাঠের বাজারটি নামকরা। পুরানো গির্জাটিও "ক্যোলন্ ডমের" মত নানা স্মৃতিবিজড়িত। ইতিহাস বিখ্যাত টাউন হল দেখবার মত। হের নিয়ে গেলেন তাই। গির্জা ও টাউন হল দুটিই এখন যুদ্ধ বিধ্বস্ত মলিন চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।···ইতিহাসের টুকরো বলছেন হের। রুথের ওসবে খেয়াল নেই। আমারও যে কোন দরকার আছে তিনি ভুলেই গেছেন। অবিরাম বকে চলেছেন নিজের কথা।

—"এ আংটিটি হের আমাকে দিয়েছেন। সব সময়েই—উনি কিছু কিছু কিনে দেন।" উইক এণ্ড্ এ বেড়াতেও নিয়ে যান। কখনো কখনো ছবি দেখান।"

—"মেয়েটিও আসে তো?"

—"না, সে জানেনা এসব। পড়াশুনো নিয়ে আছে, ওকে নিয়ে এসে কি হবে!"

ন্যুরেনবার্গ সহরটিকে পুরো দেখা যায় কেল্লার উপর থেকে। পুরণো দিনের স্মৃতি এবং বিশেষ করে গত মহাযুদ্ধের সরকারী

কেন্দ্র হওয়ায় ইতিহাস একে উল্লেখযোগ্য করে রেখেছে। আগ্রার ঐতিহ্যের কথাই মনে হোল। ফ্যুয়েরারের তৈরী অসমাপ্ত কংগ্রেস ভবন, বক্তৃতা মঞ্চ, কালো কোর্তা বাহিনীর প্রাসাদোপম বাড়ীর সঙ্গে বিখ্যাত শিল্পী Albrecht Durer এর শিল্প সৃষ্টি ও অতীতের নানা কীর্তি মিশে একটা করুণ সুর রেখে গেছে ন্যুরেনবার্গের ধুলো মাটিতে,—এদিকে, সেদিকে।

"সকালে ফুটিছে সুখ-দুখ-লাজ
টুটিছে সন্ধ্যাবেলা—"

এই তো জগতের চিরন্তন সুর!

"কাল ছিল যারা
কোথা তারা আজ—"

ট্র্যাজেডী তো এই-ই মানুষের!!

মধ্যযুগের তৈরী বাড়ী ঘরের ভগ্নাবশেষে কাঠের ভারী দরজা, কাঠের রেলিং ইত্যাদির সঙ্গে ভারতীয় পদ্ধতির কিছুটা সাদৃশ্য আছে। ভেতরে ও বাহিরের দেয়ালে অমন সব ছবি আঁকার পদ্ধতি জার্মাণীতে ছাড়া আর কোথাও চোখে পড়েনি।

ফ্রয়েলাইন কিন্তু এসবের খোঁজ রাখেনও কম—আগ্রহও যে আছে বোঝা গেল না। সেই যে কি প্রবাদ আছে না বাংলায়—"ঘরের গরু গোয়ালের ঘাস"—ইত্যাদি। কষ্টে তথ্য সংগ্রহ হলো। হের এত স্বল্প-ভাষী, সব প্রশ্নের উত্তরেই প্রায় একটা দুটা করে বই কিনে দিলেন—অর্থাৎ পড় ও উত্তর খোঁজ। তা মন্দের ভালো বৈকি।

—"তোমার এ শাড়ীর কত দাম ?"

অন্য প্রশ্ন ঠোকার আগেই আঁচলে টান পড়ে। বুদ্ধি আছে বৈকি ফ্রয়েলাইনের।

—"এসব বাংলা দেশের সিল্ক, দাম বড় জোর পঁচিশ থেকে তিরিশ টাকার মধ্যে হবে। জার্মাণ এক মার্ক;—আমাদের একটাকা দু আনা।

একবার ভাবতে চেষ্টা করলেন হয়তো বা, জার্মাণ মার্কে কত দাম এর হতে পারে।

—"কি সুন্দর ঝলমলে রং। আমার ভীষণ ভালো লাগে তোমাদের পোষাক। আমাদের শুধুই কালো রং।"

একঘেয়ে আলোচনা!

—"তুমি তো সুন্দর ইংরেজী বলতে পার।" সুর বদলাই।

—"ইংল্যাণ্ডে ছিলাম কিছুদিন।"

—"পড়তে বুঝি ?"

—"ঐ রকমই একটা কিছু হবে। পড়তে আমার ভালো লাগে না।"

আন্দাজ করে নিলাম স্কুল ফাইনালের পরে আর লেখা পড়া তেমন এগোয়নি ফ্রয়লাইনের!

—"সে সব কথা থাক, চলো কোন একটা ভালো হোটেলে গিয়ে খেয়েনি।"

বড় রাস্তার ওপরই আধুনিক হোটেল।

স্যুপের পর আমি ও বাবা নিলাম "চীকেন," তাঁরা নিলেন সেদ্ধ মাছ। পাণীয় (ড্রিঙ্ক) হিসাবে আমরা দুধ;—ওঁরা নিলেন মদ, দু'জনে দু'রকমের।

বারবার রুথের গ্লাসে মুখ দিয়ে দেখছেন হের, পাণীয় উত্তম কিনা। আবার জিজ্ঞেস করছেন অন্য রকম দেবেন কিনা। নিজের খাবারের প্লেট থেকে টুকরো কেটে রুথের পাতে তুলে দিলেন।

অন্যদের দিয়ে থুয়ে খাওয়ার রেওয়াজ আমাদের আছে জানি। ইংল্যাণ্ডে একাজ গর্হিত, খাওয়াটিই তো শুধু কাঁটা চামচের প্রদর্শনী। চামচ সোজা করে স্যুপ গিলবে না সামনে ঘুরিয়ে আনবে সেটাই প্রধান। কে কতটা কম খেয়ে পরিপূর্ণ খাওয়ার পরীক্ষা দিতে পারে হাসিমুখ করে তার ও একটা ক্ষেত্র বিশেষ। ভাগ করে খাওয়া মন্দ লাগলোনা। স্নেহের পরশ থাকে তাতে। কিন্তু একই গ্লাসে মুখ দিয়ে প্রিয়া পরিতোষ, দৃষ্টি যেন হজম করতেই চাচ্ছিল না।

ক্রমাগত ড্রিঙ্ক করে করে মুখ চোখ এত লাল হয়ে গেলো রুথের, জোবে সাপের মত নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন। অস্বোয়াস্তি লাগলো। বিশেষ করে বাবার মত গুরুজনের সামনে অবস্থাটি অতি সঙ্কোচের।

মেয়েটির কোল থেকে শাদা রুমালখানা বার বার লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে হাঁটুভাঙা হয়ে, আর হের সৈনিকের কায়দায় তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে উঠে সেখানা যত্নে তুলে গুছিয়ে

দিচ্ছেন প্রতিবারই। খাওয়ার সময় কোলের রুমাল পড়ে যাওয়া ইংল্যাণ্ডে শিশুদেরও সাজে না সম্ভবতঃ।

আমরা তুই অতিথি নির্বাক হয়ে বসে আছি। ওদের কথা চলেছে; আর্য্য ডয়েট্‌শে, অর্থাৎ খাঁটি জার্মান ভাষায়, এক লব্‌জও যার বোঝা তুষ্কর।

আবার অর্ডার গেলো মদের। বেকায়দায় পড়ে মরিয়া হয়ে ঘড়িতে চোখ বুলোই—"বিট্টে!"—অর্থ;—অনেক তো হোল ভাই, এবার বিদায় দাও।

এত তাড়াতাড়ি যেয়ে কি হবে? ছবির সময় তো অনেক আছে—তু'জনেরই বিস্তারিত চোখে সে প্রশ্ন এবং উত্তর তুই-ই।

—"ডাঙ্কে—জেহ্‌র্ (অনেক ধন্যবাদ)। হোটেলে কিছুটা প্রয়োজনীয় কাজ আছে। আবার কাল দেখা হবে—" বলে বিদায় নিয়ে নিলাম।

ন্যুরেনবার্গের রুথকে কি খুব অচেনা মনে হচ্ছে? পশ্চিমী বাতাবরণ কি সত্যিই খুব প্রগতিপন্থী?

দশ

Bon-Accord ষ্ট্রীটের মাঝারি অবস্থার হোটেলটি। পুরনো দিনের গন্ধ আছে এ কোণে সে কোণে। ঘন খয়েরী রঙে ছোপানো ভেলভেটের পর্দা ও সাবেকী আমলের ভারী-ভারী আসবাবে ভর্ত্তি কামরায় একা—দশ মিনিট ও বসা যায় না। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে—ভূতের ভয়ের মতো।

চরকীর মত মেশিনের তালে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত সকলে, দলকর্তা মিঃ এমার্সনের গুরুগম্ভীর গলা শুনতে ভাল লাগছে না।

বান্নু, ভাণু, ওয়াপ্পুলা—নেহাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেড়িয়ে গেল দৈনন্দিন প্রোগ্রাম মেনে। অসুস্থ আমি, ছট্‌ফট্ করি কিছুক্ষণ ঐ ঘরে একলা থেকে।

উইলসন এলো গরম জলের বোতল নিয়ে। ঠিক সময়টিতে এসে বিছানাপত্র গুছিয়ে যাওয়া তার কাজ। তখনও শুয়ে আমি। কথাটি না কয়ে আস্তে চলে গেল দরজা ভেজিয়ে বোতলটি রেখে।

দেখেছি তো "বেড্‌ফোর্ডওয়ে"র হস্টেলের পরিচারিকাদের। পরিচারিকা তো নয় যেন বাবার পিসীমা! কী মেজাজ! শনিবারে এসে ঐটুকু একটা ঘরে ঝাড়ন লাগাবে তাও কি দাপট! বিছানার কাপড় বদলাবার জন্য পাঁচ মিনিট দেরী

হবার সাধ্যি নেই। কণ্ঠাগত প্রাণ হলেও নিজের বিছানা বালিশটি নিজেকেই ঠিক করে নিতে হবে। অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকলেও ওয়ার্ডেনের বিনানুমতিতে তিনতলার উপর এসে কারও নাক গলাবার উপায় নেই। ভাগ্যিস সঙ্গী বন্ধুরা মেশিন নয়, নইলে লণ্ডন হষ্টেল স্বর্গের সিঁড়ি ভাই! বড় সরু সে পথ, একবার যে সে সিঁড়ি বেয়ে ওঠে আর ভোলে মনে হয় না। এক চামচ চিনি বেশী নিলে চোখ লাল! একটু গরম জল, বিধি নিষেধের কড়াকড়ি সেখানেও। কি চেহারা! কণ্ঠ থেকে তালু পর্যন্ত শুকিয়ে যায় "প্লীজ্" "প্লীজ্" বলতে। ওয়ার্ডেন মূর্তিমতী—যমদূতী!···দূর, এত ভদ্রতা আর সয় না! ভাল করেই লেপ মুড়ি দিই। ওয়েট্রেস্‌কে ভয় করে চলায় ঘেন্না ধরে গেছে!

কিছুক্ষণ পর। মাথায় হাত পড়ে কার। চাপা গলা শুনি। "মিস্ মিস্, একটু ভালো আছ কি?" হাতের ট্রে তে কফি, দুটো—মাথা ধরার ট্যাব্‌লেট;—এ্যাঞ্জেলের মতো দাঁড়িয়ে উইলস্‌ন!

—"খেয়ে শুয়ে থাকো, দশটার পরে আসবো আমি, তার আগে কেউ তোমায় ডাকবে না—"

বেঁচে থাক উইলসন! নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ি। এগারোটায় এলো আবার এক কাপ কফি হাতে।

—"খেয়ে নাও, মাথা ধুতে হবে। বদলে ফ্যালো কাপড় চোপড়।"

—"ধোবে কে ভাই ?"—জিজ্ঞেস করি।

—"সে চিন্তা করতে হবে না। সব ঠিক করে দেবো।"

বিছানার চাদর ইত্যাদি, মায় সব জামা-কাপড়—নিয়ে চলে গেলো। আরামের নিঃশ্বাস পড়ে। চিন্তাও জাগে, একি সত্যি! ইংল্যাণ্ডের পটভূমিকায় দৈনন্দিন জীবন বড় কঠিন। মনের আদান প্রদান ও নেহাৎ প্রয়োজন মাফিক। বড় জোর সাহায্য মিলতে পারে, প্রাণের স্পর্শের বালাই নেই। "শাসন করা—তারই সাজে, সোহাগ করে যেগো—" ইত্যাদি ভেবে কাউকে যে একটু হুকুম করা যাবে, তারও সাধ্যি নেই! অরসিকেষু রহস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ—সাবধান বাণী আছে শাস্ত্রে। ভাল কথা সেটা। অনুগ্রহ করে তুমি কি কাজটি করে দিতে পারবে, কিছু মনে না করে—এ ধরণের কায়দাদুরস্ত কাকুতিতে যেন গলা শুকিয়ে আসে। পাঁচদিন এক সঙ্গে থাকলে মাসী, পিসী, দাদা সম্পর্ক পাতিয়ে এক হেঁসেল করে বসি যে দেশে ;—সে দেশের মেয়ের পক্ষে মনের ব্যাকুলতা চেপে চব্বিশ ঘণ্টা ইনোনো বিনোনো—প্লীজ্, কাইণ্ড্লি আর সরি বলা—'ওফ্ অসহ্য! ল্যাবরেটরীর মাপক যন্ত্র!!···দীর্ঘকালের তৃষার্তের সামনে ঠাণ্ডা জলের কুঁজো যেন মিস উইলসন!

—"তুমি কাপড় চোপড় পরে নাও—বাইরে দাঁড়াচ্ছি।" দরজা ভেজিয়ে বাইরে দাঁড়ালো।

—"কখন খাবে তুমি ?"

—"দেড়টার পরে দিও ভাই। তোমাদের ঐ দিন-রাত জাষ্ট টাইমে অরুচি—ধরেছে। ঐ একঘেয়ে ১টা—৭টা; শরীরের দুঃখদুর্দশাও বোঝে না।"

—"কিচ্ছুটি ভেবো না। আমি দেখে যাবো। যখন খেতে চাইবে ঠিক তখন এনে দেবো।" খাবার মেনুটি জেনে চলে গেল!

আহ্ কি আরাম! একটায় খাওয়া নেই, প্লীজ্, উড্ ইউ মাইণ্ড এর বালাই—আর—টেবিলে কাঁটা-চামচের লড়াই নেই।

দুটো বাজল। কাঁটায় কাঁটায় খাবার এলো। গরম মাছ ভাজা, ওমলেট, রুটি, মাখন; সঙ্গে কফি। মূর্তিমতী করুণা!

—বিদেশের মাটিতে অসুস্থ হয়ে কেমন লাগে ভাবতে—খাবারটি সামনে ধরে—মা বলছেন—'খা বাপু, ভাল করে দইটি, অম্বলটি!'

—"তোমার যা ভালো লাগে খাও, নইলে খেয়ো না।"

—"বাঃ, বেশ তো রেঁধেছো। তাজা মাছ পেলে কোথায়?"

—"সমুদ্দুর আছে যে! নদী আছে কাছেই। টাট্‌কা মাছ পাওয়া যায় Dee নদী থেকে এ সময়েই বেশী।"

একটু ভাল লাগে। দু'জনে বেরিয়ে পড়ি বাইরে। Duthic Park টি বড় সুন্দর। ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার রাস্তা চার পাশে, মে মাসের উজ্জ্বল রোদের ঝিলিকে এত মসৃণ দেখাচ্ছে তাকে, জল লাগলে গড়িয়ে পড়বে বুঝিবা।

—"আমার মনে হয় আজকের ছেলেমেয়েরা বড় সুখী। জন্মের আগে থেকেই শিশুদের জন্য এত আয়োজন আমাদের সময়ে ছিল না। হিংসে হয় দেখে"—বলে উইলসন।

পার্কের এক অংশে ছোটদের রাজত্ব। স্বার্থপর দৈত্যের (Selfish Giant) রাজত্বে তাদের আর এখন হাত বাড়াবার প্রয়োজনই হয় না। স্কটল্যাণ্ডেও আজ শিশুকেন্দ্রিক ক্রমোন্নতির আয়োজন। শিক্ষা তো বটেই।

—"ছোটদের কেউ শাস্তি দিতে পারবে না এদেশে, উল্টো নিতে হবে সে শাস্তি মা বাবাদের।"

—"সত্যিই ছোটবেলা থেকেই তোমাদের ছেলেমেয়ের জন্য যা ব্যবস্থা প্রশংসনীয়। ভিত্ পাকা হলে তবেই তো উঠবে মজবুত বাড়ী। শিশু বয়সের পাকা ভিতই ভবিষ্যৎ এর যুবক তৈরী করে। যুবসমাজ দেশের অনেকখানি একথা স্বীকার করবে না এমন কেউ আজ আছে কিনা সন্দেহ।"

—"মানি সে কথা। কিন্তু ফল কি হয়েছে দেখ না। এত পেয়ে পেয়ে এখন মা বাবারা তাদের ছেলেমেয়ের জন্য এর চেয়েও ভাল ব্যবস্থা দাবী করেন সরকারের কাছ থেকে। খুঁতখুঁতে ভাবের অন্ত নেই।"

—"ওয়েলফেয়ার স্টেটের গোলমাল তো সেখানেই। নিষ্ক্রিয়তা কিছুটা এসেছে বৈকি। রাষ্ট্র যখন সব ব্যবস্থার ভার নিয়েছে তখন নিজেদের যেন করার কিছু নেই। ইংল্যাণ্ডের চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও এসব নিয়ে ভাবছেন বেশী করে। তবুও

ছোটখাটো দু'চারটে সমস্যা বাদ দিলে শিশুদের গড়ে তোলার এ ব্যবস্থায় উপকারই তোমাদের সমাজ তথা রাষ্ট্রের।"

—"তা অবশ্য ঠিক। শিক্ষা ও শিশুরক্ষা বিষয়ে আমাদের দেশ সত্যিই অনেক প্রগতিবাদী।"

জেনেছি স্কচ্ মা বাবা ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য সকল রকম কষ্টই সইতে পারেন। দূরে দূরে, গ্রামের ভেতর স্কুল আছে বটে, কিন্তু যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের জন্য উপযুক্ত বাড়ী ঘর নেই; ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষকেরও অভাব। একজন শিক্ষক একই কামরায় পাঁচ ছয়টি শ্রেণীর ছেলেমেয়েকে পড়াচ্ছেন, তাও দেখেছি। উইলসনের কথায় তাই সায় দিলাম। বলি—"ইংরেজ চরিত্রে সত্যিই অদ্ভুত সহিষ্ণুতা।"

—"আমরা তো ইংরেজ নই। স্কচ্। দুটিই আলাদা দেশ, আলাদা সংস্কৃতি। ইতিহাস খুলে দেখ। রাজবংশের সঙ্গে মিল হয়ে দু'দেশ এক হয়েছে। তোমরা মনে কর ইংল্যাণ্ড মানে স্কটল্যাণ্ড। মোটেই নয়। আমাদের দেশ এখন হোমরুল চায় আইরিশ ফ্রি ষ্টেটের মতো। বর্তমান রাণী এলিজাবেথকে ইংরেজ দ্বিতীয় এলিজাবেথ বলে। সেটা অর্থহীন আমাদের কাছে। কারণ প্রথম এলিজাবেথ কোনদিনই স্কটল্যাণ্ডের রাণী ছিলেন না।"

—"ইংল্যাণ্ডের সীমান্ত পেরিয়ে অবশ্য মনে হয়েছিল স্কটল্যাণ্ড সম্পূর্ণ একটি পৃথক দেশ—"

এবার ইংরেজদের ভারত শাসনের কিছুটা নমুনা দিই গল্পের

আকারে। উইলসন খুব খুশী। একগণ্ডা আত্মীয়ের নাম করলে যাঁরা ভারতে আছেন।

বৃটেন বলতে সহজ ভাবেই ইংল্যাণ্ড ও ইংরেজ কথাটিই মনে আসে (অন্ততো আমার তো তাই হয়)। কিন্তু ওদের সংস্পর্শে গিয়ে বুঝেছি ওয়েলস্, স্কটল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ ভিন্ন। এমন কি ইংরেজী ভাষা শেখা নিয়েও নানা বিরুদ্ধ মত রয়েছে। মাতৃভাষা—শিক্ষার বাহন তাদেরও ছোটবেলার। পরে শেখানো হয় ইংরেজী। আমাদের দেশের মতো ইংরেজী বলতে না পারাকে লজ্জার মনে না করে বরং গর্বিত হয় ঐ সমস্ত দেশ নিজেদের মাতৃভাষা নিয়ে। আমাদের জাতির মানসিক পরাধীনতার অবসান কবে হবে—সে সুদিনের অপেক্ষা করি !

শান্ত সুবোধ ছেলের মতো যেন ঘুমিয়ে আছে Dee নদী। কবিতা পড়েছিলাম ছোটবেলায় 'Miller of the Dee.' জেলেরা মাছ ধরছে, চুপটি করে বসে আছে জাল ফেলে। পূর্ব বাংলার খাল যেন। কাঁচা ঘাসের সবুজ রেখায় 'ডি্' নদীর শাদা জল যেন শিল্পীর আঁকা নিখুঁত ছবিটি। তীর ঘেষে চলতে চলতে মনে হলো পদাবলী কীর্তন করি। "কানের ভিতর দিয়া" নয় অবশ্য, চোখের ভিতর দিয়া সে ছবি মরমে পশিল গো !

—"প্রচুর মাছ 'ডি্' নদীতে। সস্তাও এ সময়ে। গ্রীষ্ম ছাড়া অন্য সময়ে শুকনো মাছই খেতে হয়।" উইলসন বলে।

এই সুযোগে একবার বলে নিতে কসুর করি না, "এমন

দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমি।” আহা! তাজা ইলিশের ঝোল আর গরম ভাত! পদ্মা, কর্ণফুলী গঙ্গার ভরা জোয়ার, দু'পাশে সবুজ শস্যের আহ্লাদ,—এমনটি ওরা পাবে কি কোথাও?

সমুদ্র তীরে যাবার জন্য ট্রাম ধরতে হলো। ঘড়্ ঘড়্ আওয়াজ মধ্যাহ্নের কোলকাতাকে মনে করিয়ে দিল। লণ্ডনে ট্রাম উঠে গেছে অনেকদিন। উত্তর সাগরের (North See) কোলটি ঘেঁষে এই ‘এবারডিন’ (Aberdeen) সহর। ট্রাম সমুদ্রতীরে নামিয়ে দিলে। ব্যাগ্ খুলতে যাচ্ছি। হাত চেপে ধরলে উইলসন।—“না, না, সে তোমাকে ভাবতে হবে না।”

যেদেশে স্ত্রী স্বামীকে এবং স্বামী স্ত্রীকে নিজ নিজ বাস ভাড়া দিয়ে দেয় সে দেশে বন্ধুকে গাড়ী ভাড়া দেওয়া আশ্চর্য বৈকি! তাও হোটেলের একজন সামান্য চাকুরে মাত্র উইলসন।

উত্তাল তরঙ্গ উত্তর সাগরের ক্ষুব্ধ বুকে।—এই তো ক'দিন আগে এই সাগরেরই তীব্রতা প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে ইংল্যাণ্ডের পূব কূলে আর হল্যাণ্ডের উত্তর পশ্চিমে। স্রোতের মুখে শেওলার মত ভেসে গেছে মানুষ, গরু, শূকর, ছেলেমেয়ে, ঘর বাড়ী। জমে গেছে তারপর উত্তর সাগরের বরফের মত ঠাণ্ডা জলে।

রোদ পোয়াতে এসেছে একজন নয়, দু'জন নয়, হাজার হাজার লোক। শুয়ে বসে খেয়ে সেলাই ফোড়াই নিয়ে সারাদিন কাটাবে ঐ সাগর আর বালুকার সঙ্গম ক্ষেত্রে।

দু'টি মেয়ের হয়তো বা খুব বেশী সখ হয়েছে তাই ঢেউ কাটিয়ে সাঁতার দিচ্ছে। শুধু ওরা দু'জন। এক মহিলা ছোট দুটি ছেলে নিয়ে এসেছেন। এক পা হাঁটে আর নুড়ি কুড়োয় দু'টিতে। মায়ের হাত আলগা হয়ে যায়। মাকেই অপেক্ষা করতে হয় ছেলের খেয়ালে।

"জগৎ পারাবারের তীরে
শিশুর মহা মেলা—"

সমুদ্রের তীরে বড় মানায় অশান্ত শিশুদের। —"বড় নিষ্ঠুর এ সমুদ্র।"

উইলসনের মনের ভাব বুঝে নিতে দেরী হয় না। পদ্মানদীর ভাঙনের কথা যেমন ভোলা যায় না, তেমনি উত্তর সাগরেরও। তবুও সুন্দর সে। উদাত্ত বাহু মেলে প্রচণ্ড আবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বারবার। —"চল এবার তোমাকে নাচের নূতন হলঘর দেখাই। রাণীর অভিষেকের সময় এখানে খুব বড় রকমের নাচ হবে।"

সমুদ্রের কূল ঘেঁষেই নাচের মস্তো হলঘর—এ ছাড়া খোলা হাওয়ায় বসার সকল সুবিধা; মায় কাফেখানা, চায়ের দোকান, টয়লেট, কি যে নেই। একটা জিনিষ; সকলের আনন্দ ও আরামের জন্য ব্যবস্থা রেখেছে এসব দেশ। বলে;— পরলোক আবার কি! খাও, পিয়ো, মেতে যাও সব কিছুতে। "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ!"—রিয়াল ডেমোক্র্যাসী! আল্লস

পর্বতের তুষারশৃঙ্গে ও চেয়ার টেবিল, খাওয়ার ব্যবস্থা !! কাজ খুঁজে নেয় বটে !!

হলে ঢুকে দেখি—রাজকীয় ব্যাপার ! কাঁচের ঝালরের কি বাহার ! সুন্দরীরা নিশ্চয়ই প্রস্তুত হচ্ছে করোনেশান নাচের জন্য ! জিজ্ঞেস করি—"টিকিট লাগে না ?"

—"লাগে। তবে মূল্য খুব বেশী নয়।"

ছটো অরেঞ্জ এর গ্লাসে চুমুক দেই ছ'জনেই। কলেজ ষ্ট্রীটের কফি হাউসের আমেজ মনে। পয়সা এবার আমার ব্যাগ থেকে।

—"এবার ফিরি চল। তোমাদের সন্ধ্যেয় খাবার আছে, চা দিতে হবে। তোমার বন্ধুরা ফিরবে এবার।"

—"কয়েকটি জিনিষ দরকার যে উইলসন।"

—"আমার বন্ধুর দোকান আছে হোটেলের কাছে, পরিচয় করিয়ে দিয়ে যাবো। অর্ডার দিয়ে যেও ! সন্ধ্যের পরে এসে আমিই নিয়ে যাবো জিনিষগুলো।"

সন্ধ্যার সময়। মিঃ হীটন এর কী আপশোষ। বলে—"সবচে বুদ্ধিমতী তুমিই। আমারও ইচ্ছে করে ইউনিভার্সিটি গ্রুপের গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে যাই কোথাও মাঝপথে। সারাটি দিন মাঠে মারা গেল আজও—ইত্যাদি।

এর পরের তিনটে দিন কি যত্নই না উইলসন করলে সকলকে। প্রাণ ভরে খাওয়া গেল মাছ ভাজা, ডিম ভাজা, আলু ভাজার সঙ্গে লঙ্কার গুড়ো !

ফিরে আসার দিন সকলে মিলে একটা দামী সেণ্টের শিশি ওকে দিয়ে এলাম। বনিল্যাস্ (Bonnie-lass) এর দেশে এরকম কতো বন্ধু দেশের মাটির গন্ধে মন ভোলায়। পরিচারিকা বলে তার কোন পৃথক শ্রেণী বিভাগের প্রয়োজন হয় না।

শরৎচন্দ্রের সাবিত্রী শুধু গল্প নয়, এ আমি বিশ্বাস করি আজকাল।

—০—

এগার

ষ্টুটগার্ট।

ভারী সুন্দর সহর পশ্চিম জার্মাণীর। রাইন নদীর দু'পাশে পাহাড়ের কোল ঘেষা ছোট ছোট সহরগুলি আর আঙুরলতার স্বপ্নিল আবেশের পরেই নাম করতে হয় ষ্টুটগার্টের। পাহাড়ের মাঝখানে উপত্যকা অংশে নূতন তৈরী ষ্টুটগার্ট। গত যুদ্ধের সময়ে একদিনে ষোলবার বোমারু বিমান এর উপর চড়াও হয়ে সমতল বানিয়েছিল একে। ধ্বসে পড়া ষ্টুটগার্টের পোড়া-মাটির উপর আজ জন্মেছে নতুন ফসল। দেখা দিয়েছে নতুন আশার আলো। একখণ্ড জমিতে সাজানো, মনে হয় ছোট ছোট লাল বাড়ীগুলো। আঙুরের চাষে ঘন সবুজ পাহাড়ের কোল। ট্রাম লাইন উঠে গেছে ঘুরে ঘুরে ওপোরে। এ যেন শিলংএর পাহাড়ে পথ। যতই ওপোরে ওঠা যাচ্ছে, ততই এগিয়ে আসছে সহরের স্তরে স্তরে সাজানো অংশ দৃষ্টির সমান্তরালে।

একেবারে উপরে উঠেই যেখানে ট্রাম থামে একবার, তারই গা ঘেঁষে আর্ট স্কুলের শাদা বাড়ীখানা। ইভার শিক্ষা এই আর্ট স্কুলেই।

"চাচা-কাহিনী"র জার্মাণ মেয়ের শ্রেণীতে পড়ে না ইভা। পরশুরামের কদলীবৃক্ষ জাতীয় অথবা মার্চ করা, এমন কি

পদ্মীপিসী ও বামাঠাক্‌রুণ শ্রেণীর মেয়েও সে নয়। ঐ সরু নূতন পাতা ওঠা—যুঁই লতাটিরই মতো নরম ও শীর্ণদেহী ইভা। জামার উঁচু কলারও তার গলার হাড় ঢাকতে পারেনি। চোখে লাগার মত গর্ত গলার মাঝখানে। পিঠের ও কাঁধের দিকে পাখীর পাখার মত স্পষ্ট দেখা যায় অস্থি দু'টুকরো। মজে আসা নদীর মত শুষ্ক লাবণ্যে অতি শান্ত সুষম শ্রী ইভার। প্রথম দৃষ্টিতেই ভালবেসে সান্ত্বনা দিতে সাধ যায়।

অতি পুরণো দিনের বাড়ী। ওপোরের তলায় ইভা আর তার স্বামী থাকে। নীচের তলা বাড়ীওয়ালীর। বাগানের ভেতর দিয়ে পথ, যেমন উত্তর কোলকাতার একতলা ও দোতলা। শোবার ঘরটি এত নীচু, দাঁড়ালে মাথায় লাগে। এক ইটের গাঁথুনি, হাল্‌কা দেওয়ালে কাগজ আঁটা। শীত ও গরম দুই-ই তীব্র ঘরের ভেতরে ঋতু হিসাবে।

ফুলের বড় দাম। তবুও এক গুচ্ছ হলুদ ও বেগুনী ফুল দিয়ে স্বাগত জানায় ওরা স্বামী-স্ত্রী।

সরল চোখের চাউনি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করে অনেক কথা ইভা। সে ভাবে, ধনীর দেশ ভারতবর্ষ। সকলেই বুঝিবা উজির-নাজির,—প্রধান! কার্ল যদি একটি চাকরী পায় তো চলে যায় ভারতে। তারই আশায় দিন গুনছে সে। পাসপোর্ট ইত্যাদিও নাকি করে রেখেছে কার্ল।

—"তোমার বাবা একটা চাকরী দিতে পারে নাকি কার্লকে?"

—"অভিজ্ঞ ও প্রবীন লোক না হলে কোন বিদেশীকেই কাজে ডাকতে পারে না আমাদের দেশ এখন। কার্ল তো সবে পাশ করে বেরুবে।

ষ্টুটগার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে বাড়ী ঘর ইত্যাদির নক্সা তৈরী বিভাগের ছাত্র কার্ল। পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে। গত যুদ্ধে পাইলটের কাজ নিয়ে বেলজিয়ামে ছিল, এখন আবার ছাত্র হিসাবে নাম লিখিয়েছে।

—"তোমাদের দেশ কি শুধু বুড়ো মানুষদেরই কাজে ডাকে ?"

ইভা কূটনীতি, রাজনীতির ধাব ধারে না। জানে না ভারতবর্ষের আদি ও বর্তমান। কোন দেশের বৈদেশিক নীতি নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন প্রচেষ্টাও তার নেই। "ইজ্‌ম্" এবং লাল-কালোর ভেদাভেদও সে বোঝে না। পাশ করে এলে কার্লএর একটি চাকরী হবে, তাহলে ওদের আর অভাবের দুঃখ থাকবেনা ;—ভাবখানা এই ; ওকে বোঝাতে সময়ের দরকার হলো যে আমাদের দেশেই মানুষের খাওয়া পরার কষ্ট ; কাজের অভাবে জীবন ছন্নছাড়া। বিদেশীকে ডাকবার তার সুযোগ কোথায় ?

সন্ধ্যেবেলায় খেতে ডেকেছে ইভা। ওর শ্বশুর কোলকাতাতেই আছেন। আমার জার্মান শেখার প্রথম তালিম তারই কাছে। পরিচয়ের সূত্র ওখানেই।

হালকা টুকরো করে কাটা দুটো ডিম পাউরুটি, চীজ,

ষ্ট্রবেরী জুস ও শুকনো কুঁচো চিংড়ী দেখে শুধু বাংলাদেশের পঞ্চ-ব্যঞ্জনের স্বাদই রসাল হয়ে মনে এলো। ঐ শুকনো পাউরুটি চীজ্ আর এক ফোটা ডিম খেয়ে কি তৃপ্তি হয়? ঠাণ্ডা দুধ রয়েছে বড় দু'বোতল—তাই খেতে অনুরোধ জানালে বার বার। এর চেয়ে বেশী সংগ্রহ করতে পারেননি, কথায় সে কুণ্ঠার আভাস।

পরদিন ইভার রান্নাঘরেই ভারতীয় খাবারের আয়োজন হবে ঠিক করে চলে এলাম।

ভাত, মুরগীর ঝোল, আলুকফির ডালনা, টমাটোর চাট্নী আর ফুলকফি ভাজা এই মেনু।

সারা বাজার ঘুরে ঘুরে জিনিষপত্র কেনা হলো। ইভা আর কার্ল বিব্রত লঙ্কার গুড়ো খুঁজে। শেষে পাওয়া গেল ইটালী থেকে আনা বড় বড় সবুজ লঙ্কা। ঝোল কম।

এটা ওটা এগিয়ে সাহায্য করে ইভা। টেবিল ভর্তি খাবার দেখে দু'চোখ ওর বিস্ফারিত। বললে—"মুরগীর বড় দাম এখানে।"

দুটো মানুষ ওরা প্রচুর খেলে নিঃসঙ্কোচে। লঙ্কার ঝালে এত নূতনত্ব, ওদের আনন্দের সীমা থাকে না। এমন রসালো খাওয়া অনেকদিন নাকি হয়নি।

কার্ল বেরিয়ে যায়, শেষ ট্রাম ক'টায় ছাড়বে জেনে আসবে।

ইভা এবার মুখ খোলে। বলে—"কার্লএর বেশ কষ্ট। একটা চাকরি পেলেই ভাল হয়। বিয়ে হয়েছে আমাদের

দু'বছর। কিন্তু এই কিছুদিন হয় শ্বাশুড়ী আসা-যাওয়া করছেন। তাঁদের মত ছিল না এ বিয়েতে তাই দু'বছর খুব কষ্ট দিয়েছেন।"

এদেশেও তাহলে শাশুড়ী ভীতি আছে। আমি তো জানতাম শাশুড়ী ও ননদ ভীতি শুধু বাংলাদেশেরই একচেটিয়া !

ছবি বের করলে ইভা, বাবা ও দাদার। সুন্দর স্বাস্থ্যবান ভাই। বাবার ছবি দেখে বিশ্বাসই করতে ইচ্ছে হোলো না ইভার মত রিক্ত চেহারা তার মেয়ে হতে পারে !

ইভাদের আদিবাস পোল্যাণ্ডে। সৈন্য বিভাগের কর্তা ছিলেন তার বাবা। ভাই ছিলেন বেলজিয়ামে, বিমান বিভাগের উচ্চপদে। মা ইংরেজী বলেন চমৎকার, সেকেণ্ডারী স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন, শেখাতেন ইংরেজী ভাষা। ওরা এক ভাই, একই বোন। সম্ভ্রান্ত পরিবেশে অন্যান্য পরিবারের মত ইভাও মানুষ হলো।

তারপর ইউরোপে বাজলো যুদ্ধের দামামা। ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক ছোট বড়—আমীর ওমরাহ সকলেই জড়িয়ে গেলেন। ইভার বাবা মারা গেলেন পোল্যাণ্ডে, ভাই মারা গেলেন আকাশ যুদ্ধে বেলজিয়ামে। মা ও মেয়ে তারপরেও সামান্য আশা নিয়ে ছিলেন পোল্যাণ্ডে। এক সময়ে সুরু হলো জার্মান বিতাড়ন পোল্যাণ্ড থেকে। বাধ্য হয়ে এদের দু'জনকেও বেরিয়ে আসতে হলো।

—"তুমি জানোনা ফ্রয়লাইন (Fraulein-মিস) কি ভাবে কুকুরের মত আমরা বিতাড়িত হয়েছি। একে তো পথে

নির্যাতন, তার উপর সঙ্গে যা ছিল সীমান্ত পেরোতে দিলো না সে সব নিয়ে। আমার বাবার সমস্ত জীবনের সঞ্চয় এমনি করে আসতে আসতে পথেই শেষ। কার্ল্‌এর কাছে এসে উঠলাম হের ও ফ্রাউ (Herr and Frau—মিঃ ও মিসেস) এ নিয়ে খুব মন কষাকষি করলে। নিঃসম্বল মেয়েকে তাদের বৌ করার ইচ্ছে একেবারেই ছিল না। দু'বছর পরীক্ষা করার পরও যখন কার্ল্‌এর মন টললোনা, তখন বাধ্য হয়েই গির্জায় গেলেন ফ্রাউ। কিন্তু মন খুলে আশীর্বাদ করেননি—সে আমি জানি।"

অস্পষ্ট বিজলী আলোয় আরও পাংশুটে দেখাচ্ছে ইভাকে। ওর হাল্‌কা নীল চোখে গভীর বেদনার ছাপ।

দেয়ালে সতরঞ্চি ঝোলানো আছে। ওতে কিছুটা শীত নাকি কম মনে হয়।

—"এসব আমারই হাতে বোনা। পুরনো কাপড় দিয়ে করা। কার্ল্‌ ঘরে না এলে আমি তো বেরুতে পারি না। সারাদিন ঘরে বসে এসব কাজ করি।" আমরা যেমন চটের উপর সূতোর কাজ করি সে রকম কয়েকখানা আসন বের করে দেখালে। সুন্দর সুন্দর পুতুল তৈরী, জানলার কাঁচে ছবি আঁকা (Stained glass) ইত্যাদিও তার জানা আছে। পুতুলগুলি সত্যিই সুন্দর ও নিখুঁত।

পাশেই একটা ঘর। পায়রার খোপের মত। সেটাই কার্ল্‌এর কাজের ঘর, নানারকম কাঠের জিনিষপত্র। দেয়ালে বাড়ীর পরিকল্পনা ইত্যাদির নক্সা ঝোলানো।

আমাদের রান্না করা খাবার থেকে একটুখানি তুলে রাখলো ইভা—“মাকে দেবো।” মাও থাকেন এ বাড়ীতেই, নীচের তলায় অন্য একটি কামরা ভাড়া নিয়ে।

মাকে দেখলাম পরদিন। বিষাদের প্রতিমা। আমাদের দেশের সদ্য বিধবার মত—মলিন মুখশ্রী! কাগজের মত ফ্যাকাশে শাদা রং। ইভারই মতো ভীরু ও শান্ত।

ভারতবর্ষ দু'ভাগ হয়ে যে দুর্দশা এনে দিয়েছে আমাদের শরনার্থীদের জীবনে, তার সঙ্গে কিছুটা মিল আছে বর্তমান জার্মানীর। তবুও মনে হয় তাদের তুলনায় আমাদের শরনার্থী-দের দুঃখ তত ভয়াবহ নয়। এদের অভিযোগ করবার উপায় আছে, সাহায্য পাবার আশা আছে, কিন্তু ইউরোপের যুদ্ধের বিভীষিকা ও বীভৎসতার ছবি বুকে নিয়ে আজও যারা বেঁচে আছেন, তাঁদের মুখ খোলার সুযোগ কোথায়? অভিযোগ করবে তাঁরা কার কাছে? এই মূক প্রশ্ন বয়ে নিয়ে ক্লান্ত তারা, তবুও নিরাশ নয়।

একটি কথা মনে শুধু ঝড় তোলে—রাজনীতির আবর্তে সমস্ত জগৎ ছুটেছে লক্ষ্য কি কেউ জানে? ক্ষমতা লোভের মার-প্যাঁচে—লাল-কালো-ধলো—সকলেই খেলছে সাধারণ মানুষের ভাগ্য নিয়ে। শয়তান এরা;—লাল-কালো আর ধলো!

ষ্টেশনে ইভা বিদায় দিতে এসেছিল ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যেও—চারটি চার রঙের আধফোটা তাজা গোলাপ নিয়ে।

বার

গত জানুয়ারীতে (১৯৫৩) আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রুপ গেলো হল্যাণ্ডে, সরকারেব অতিথি হয়ে। লুংও নাম লেখালো আগ্রহে! কিন্তু লুংএর বন্ধু ভয় পাইয়ে দিলে—"ওখানে গিয়ে কি করবি তুই? তোর সঙ্গে কথা বলবে কে শুনি?" লুং নাকি জবাব দিয়েছিল—"আমার ভারতীয় বন্ধু।"

কৌলুনের অধিবাসী লুং, উচ্চ শিক্ষার জন্য এসেছিল লণ্ডনে, কিন্তু শত চেষ্টা করেও ইংরেজীটাকে আয়ত্ব করতে পারলোনা বলে দুঃখ ও সঙ্কোচ ছিল তার বড় বেশী।

লুং আর আমি এক ঘরে ছিলাম বেশ কয়েকদিন হল্যাণ্ডের ইউট্রেক্ট (Utrecht) সহরে। ঘরোয়া আলাপের সুযোগ মিলেছিলো তাই।

গতযুদ্ধে তার স্বামী মারা যান জাপানীদের হাতে হংকং এ। ছেলেমেয়ে দুটি নেহাৎ শিশু তখন। অকস্মাৎ এসে পড়ে লুংএর সুখী জীবনের উপর ঘটনাটি। অল্প বয়স, ঘাবড়াবারই তো কথা। কিন্তু জায়গা-জমি ছিল কিছুটা, ভাইরাও এসে পেছনে দাঁড়ালো—আবার সোজা দাঁড়িয়ে গেল সে। ভায়েদের হোটেল ব্যবসা, লুং ও অংশীদার হয়ে কাজে লেগে গেল।

চীনা সমাজে দ্বিতীয়বার বিয়ে করার রীতি আছে, কিন্তু

বাঙালী মায়ের মতো সেও পারছে না সে ভাবে জীবনের গতি ফেরাতে ছেলেমেয়ে দু'টির মুখ চেয়ে।

সত্যিকারের সুন্দরী লুং। ওর গোলাপী রঙ্ ঢলঢলে স্বাস্থ্য ও পটে আঁকা চীনে মেয়ের মতো কুচকুচে সুর্মা ঢাকা নেহাৎ ছোট চোখ দুটিকে দেখে ইংরেজ মেয়েরাও প্রশংসা না করে পারেনি। হংকং এর ঐ অঞ্চলে একটি মাত্র মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল মেয়েদের জন্য। এখন লুং এর স্কুল মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে মেয়েদের মানসিক উন্নতির পথ বেশ কিছুটা সুগম করে দিয়েছে।

নিজের কিছুটা জায়গার উপর লুং প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলেছিল, স্বামী মারা যাবার পর নিজেকে কাজের ভেতর রেখে সান্ত্বনা দেবার জন্য। সরকারী কোন সাহায্য সেদিনে পাওয়া নাকি বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। মাত্র ক'বছর। এখন তার স্থাপিত মিড্‌ল্‌স্কুল শুধু কৌলুনে নয় হংকং এ একটি নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সরকার সাহায্য দিতে চায়, কিন্তু লুং এখন গররাজী।

প্রচুর ছবি দেখিয়েছিল লুং তার স্কুলের।

লুং এর নাকী সুরের অস্পষ্ট কথা বুঝতে ও তাকে কোন কথা বোঝাতে এত সময়ের দরকার হতো;—অনুভব করতাম সেজন্যে। ভাষার ত্রুটিতে অনেকে তার সঙ্গ পছন্দ করতেন না। কিন্তু আমি জানি, ভেতরটা ওর তেজীয়ান, খরস্রোতা নদীর মতো।

—"আমার হোটেলের আয় থেকেই আমি এ স্কুল চালাবো। সরকারের কোন সাহায্য নেবার ইচ্ছে এখন আর আমাব নেই। সকলে বলে আবার বিয়ে কর। আমি বলি কেন এই তো বেশ আছি।"

কম্যুনিষ্ট চায়না সম্বন্ধে ওর ধাবণা কিন্তু অন্যরকম, যা আমি আশা করিনি। বলে—"হাজার হাজার লোককে সে দেশ তাড়িয়ে দিয়েছে।" কতো কথা জিজ্ঞেস কবেছি চীন নেতা মাউ সে তুংএর বিষয়ে। সে আমার উচ্চারণকে ভুল বলতো—তার মতে মাউ-ছে-টাক্; মাও সে তুং নয়। ওর নাকি ইচ্ছে জাগে খাস চীনে যাবার। দেশের মাটির বড় মায়া। কিন্তু গেলে যদি ফিবে আসতে না পারে তখন কি হবে ভেবে নাকি ওর আর যাওয়া হচ্ছে না।—"যেতে চাই, কিন্তু ভয পাই, বেরিয়ে আসতে দেবে না।" চীনদেশ ওর কাছে নাকি দ্বিতীয় রাশিয়া।

—"লেখাপড়া জানা লোক চীনে বড় কম—আমার ইচ্ছে ওদেরই জন্য কিছু করি। এখন এই আমার লক্ষ্য। চীনবা তো অর্থশালী নয। দারিদ্র্য ওদেরও অসীম।"

দেশে ফিবে গেল লুং আমাদের সকলের আগে।

ব্যবসায় ক্ষেত্রে আমাদের মেয়েদের তেমন সম্মান নেই। এ ছাড়াও ব্যবসা ক্ষেত্রের নারীরা চলনে বলনে এমন এক জগতের হয়ে দাঁড়িয়েছেন যেখানে সাধারণ মানুষ থৈ পায় না। ভাবে তারা অবাক হয়ে—"এরা কারা গো?" লুং ব্যবসা চালিয়ে

ছেলেমেয়ে মানুষ করছে। স্বামী হারিয়েছে কিন্তু সর্বস্ব খোয়ায়নি। সঙ্গে সঙ্গে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় চালাচ্ছে, অথচ সে সাধারণ জগতেরই শালীনতা সুন্দর মেয়ে। ভাল লাগে ভাবতেও লুং-এর মতো মেয়ের কথা।

লুং কিন্তু জীবন্ত দৃষ্টান্ত, কাহিনী নয়, রং তুলির ছবিও নয়।

তের

এপেলবাগেন (Apelvagen) সত্যিই আপেলেরই বাগান। লাল গোলাপের মত রং নিয়ে আপেল ঝুলছে গাছে গাছে। সাধ্যি কার জিভে জল চাপে! চোখ দু'টোকেও অবশ্য বড় টানে। ছোট ছোট সুন্দর পথ পাহাড়ে এঁকে বেঁকে ওঠানামা করেছে। সে সুষমায় অপরিসীম শান্তি। ঝিরঝিরে হাওয়া গাছের ডালপালায়।

ঝাঁকড়া মাথা সঙ্গীনধারী শত সৈন্যের মতো মনে হয় দূরের বনানী। সামনের হ্রদের জলে ঝিলিমিলি তরতরে রূপ। এ্যাস্ট্রিড্ (astrid) এব ছবি আঁকার ঘরটি থেকে দেখা যায় এই দৃশ্যপট। বনের মর্মর আর আলোছায়ার খেলাঘর এপেলবাগেনে ছোট বাড়ীটি করেছে সে, বেশীদিন হয়নি।

স্বামী স্ত্রী দু'জন মাত্র প্রাণী। ছেলে, বৌ নিয়ে আলাদা বাড়ী করেছে। মেয়েরা নিজের নিজের ঘর নিয়ে আছে "ষ্টক্‌হমেব"ই (Stockholm) আশে পাশে।

এ্যাস্ট্রিডের স্বামীর পিতামহ ইলেক্‌ট্রিসিটির Angstrom unit এর আবিষ্কর্তা। এদের বংশের নামেই উপসালা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে "চেয়াব" আছে।

—"সপ্তাহে সবদিন রাঁধতে ভাল লাগে না। যেদিন

ছবি আঁকায় ব্যস্ত থাকি সেদিন আর ঘরে খাবার ব্যবস্থা করি না। দু'জনে হোটেলে গিয়ে খেয়ে আসি।"

—"ছেলে ও ছেলের বৌ কাছে থাকলে তো তোমাদের এ অসুবিধা হতো না।"

—"অসুবিধা তো হচ্ছে না! ছেলেমেয়েদের এখন আনন্দ করার সময়। আমরা বুড়ো হয়েছি। আমরাই যাই ওদের দেখতে ওরা আসতে না পেলে।

পাইনের বন সামনে পেছনে রেখে ওদের বাড়ীখানা। কোথাও খর্ব হয়নি প্রকৃতির দেওয়া রূপ। একটি কাটা গাছের গুড়ির ওপোর বাড়ীটির নম্বরও অন্য পাশে এক গুড়িতে রাখা হয়েছে চিঠির বাক্সটি। বুনো সৌন্দর্যে মাতাল করা অঞ্চল এটি।

কি বৃষ্টি, কি বৃষ্টি! ঝুম্‌ঝুম্ ঝপঝপে আওয়াজে "রিমিকি ঝিমিকি ঝরে; ভাদরের ধারা; বঁধু দয়া কর"—ধরণের উদাস করা পরিবেশ। মন ধেয়ে চলে ঘরের পিছু! ছোট্ট গাড়ীখানা বেসামাল। তবু "টোর্ড" (Tord) নিজে চালিয়ে নিয়ে এলো ঘরে। বুড়ো মানুষ, বৃষ্টির মাত্‌লামোকে ডিঙোতে গিয়ে হিমসিম।

হাত পা গরম করে বসি সকলে। এ্যাসট্রিড গল্প করতে বসে তো টোর্ড যায় কিচেনে, আর টোর্ড ফেরে তো এ্যাস্‌ট্রিড্। মুরগীর মাংস, ভাত, চালের গুড়োর স্যুপ ও নিজের হাতে তৈরী পিঠে; অনাড়ম্বর আয়োজন। ধূপকাঠি পুড়ছে খাবার টেবিলটিতে। আশ্রমের পবিত্রতা ঘরে।

—"ভারতবর্ষ আমাকে হাত বাড়িয়ে ডাকে—"

—"কেন ?

—"শান্তির পথ খুঁজছে ইউরোপ। পাচ্ছে না। আমার ধারণা সে পথ ভারতের পথ।"

—"অর্থাৎ।"

—"আমরা ইউরোপের দেশগুলোর মুখে শান্তির বাণী নিয়ে ডিফেন্সের নামে গড়ে তুলি শয়তানী চক্র। কেউ কাউকে বিশ্বাস করি না। শান্তি নেই কোথাও।"

—"ভারতবর্ষের কাছ থেকে কী আশা কর ?"

—"সুইডিস্ আমরা। ইতিহাসে দেখ, সব সময়েই শান্তি চেয়েছি। কিন্তু পর পর দুটি যুদ্ধের সাক্ষী হয়ে বিশ্বাস হারিয়েছি এখন শান্তিতে। জান, সুইডেনে কি পরিমাণ পাগলা গারদ ও হাসপাতাল বেড়ে গেছে ? হিংসা নিয়ে কেউ বাঁচতে পারবে না। ভারতের অহিংসা পথই কাম্য আমাদের।"

—"যুদ্ধ তো প্রত্যক্ষ ক্ষতি করেনি তোমাদের !"

—"ওফ্, সেও ছিল অনেক ভালো। অপ্রত্যক্ষ ক্ষতির যে বিভীষিকা সে অনেকটা বেঁচে মরে থাকার মত। সে বিভীষিকাই আমাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিয়েছে। ছেলেমেয়েদের সামনে এক বিরাট অন্ধকার। বিশেষ করে যুব সমাজ মনে করছে 'কে জানে কাল বাঁচবো কিনা ?' সমাজে—এ নিরাশার বিষ-ক্রিয়া অতি সাংঘাতিক।"

—"ভারতবর্ষের অহিংসা নীতিকে তো নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগও দিতে পার!"

—"না, সে ধারণা একান্ত ভুল। জাগতিক সুখই (Material happiness) জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। আত্মার বিস্তার, ভোগে ত্যাগ,—ভারতীয় দর্শনের মূল কথা। মনুষ্যত্বের বিকাশে আত্মার প্রসার চাই। নইলে শুধু ভোগ আর তারই জন্যে অন্যকে গ্রাস করার চেষ্টা; যুদ্ধ যার চরম পরিণতি। এতে শান্তি আসতে পারে না। অহিংসা নিষ্ক্রিয় নয়।"

—"ভারতের লোকই আজ নিজের মত পথ ছেড়ে ইউরোপকে নকল করছে ভাই! কারো কাছে ইংল্যাণ্ড স্বর্গ, কারো কাছে ফ্রান্স, আবার কারো কাছে রাশিয়া! সে ক্ষেত্রে তোমরা চাইছ ভারতের দিকে;—এ কেমনতরো ব্যাপার?"

—"সাবধান ভাই, খুব সাবধান। সে পথ অত্যন্ত মারাত্মক। আমরা যা ছেঁড়া কাপড়ের মতো ফেলে দিচ্ছি তাকে কুড়িয়ে নিতে যেওনা। নিজস্ব যা আছে তাকে হারিয়ে দেউলিয়া হয়োনা। ভারতের অহিংসা পথই আজ ইউরোপকে স্নায়ু যুদ্ধের হাত থেকে বাঁচাতে পারে।"

—"আশ্চর্য মানুষের মন ও তার গতি। যেমন ধরো, ইংল্যাণ্ডের বন্ধুরা বলেছে—ওদের অবস্থাও "তত্ কিম্ গোছের। ওরা কাঁদছে আজকের যন্ত্র সভ্যতার নাগপাশে চাপা পড়ে।

লক্ষ মানুষের মাঝে থেকেও প্রতিটি মানুষ একা। অধ্যাপক এমার্সন বলতেন—মানুষকে এখন সেই আদি যুগে, গহ্বরে ফিরে যেতে বলি। কি লাভ এই লেখাপড়া আর তথাকথিত সভ্যতায়। মানুষ কোথায় হারিয়ে গেছে। অথচ কী না হচ্ছে শুধু মানুষেরই কল্যাণ প্রোপোগণ্ডা সামনে রেখে!"

—"আমারও সে প্রশ্ন, সাজেনা।"

—"জানিনা আমার উপলব্ধি সত্য কিনা, এ্যাস্ট্রিড! আত্মকেন্দ্রিক, দেহ-সর্বস্ব ইউরোপের প্রতিটি দেশই ঐ ভাবে ভেতরে ভেতরে এ বেদনা জমিয়ে রেখেছে।"

মাথা নাড়ে এ্যাসট্রিড, ধীরে ধীরে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য ওরা দুজনেই। বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণদেব, ভারতীয় দর্শন ইত্যাদি বই সে অনুবাদ করেছে। উপনিষদ ও গীতা নিয়ে আজকাল নাড়াচাড়া করছে অনুবাদের আশায়। সাংবাদিক হিসাবে তার নাম আছে। কিন্তু সত্যিকারের পরিচয় তার শিল্পী হিসাবে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যেদিন নোবেল পুরস্কার আনতে যান, এই মেয়েটির সেদিন দোভাষীর কাজ করেছিল। সেদিনের আঁকা রবীন্দ্রনাথের অবশিষ্ট একটিমাত্র ছবি সে আমাকে উপহার দিয়েছিল। উচুদরেব সে ছবি।

এই মেয়েই কোলকাতা তথা ভারতভূমি দেখে ফিবে গেল সুইডেনে একমাসও হয়নি। হাওড়ার দুর্গন্ধতম এক অঞ্চলে খোঁজে গেল এক সন্ন্যাসীর। গলিত শবের মতো কুৎসিৎ

অঞ্চল। এখানে মনুষ্যত্ব নিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। বিদেশীর সামনে এ ছবি দেখানো কতো দুঃখের !

—"তোমাকে নিয়ে এলাম এ রকম জায়গায়, অত্যন্ত দুঃখিত।"—কুণ্ঠিত হয়ে বলে এ্যাসট্রিড।

—"যত মন্দই হোক, সেতো আমারই দেশ এ্যাসট্রিড।"

চুপ করে যায় সে। বেদনার ছাপ লেগে থাকে তবু মুখে।

সন্ন্যাসীর নাম স্বামী সদানন্দ। লাইপজিস্ বিশ্ববিদ্যালয় (জার্মানীর) এর অধ্যাপক ছিলেন যুদ্ধের আগে। Concentration Camp এ বন্দী হলেন যুদ্ধে। পরিচয় সেখানে অন্য এক জার্মান শিক্ষাবিদের সঙ্গে। সংস্কৃতের পণ্ডিত। অধ্যাপককে সংস্কৃত শিখিয়ে নিয়ে এলেন ভারতবর্ষে। এখন বাংলা বলেন বাঙালীর মত। শ্রীচৈতন্য বলতে পাগল। ঘরে তুলসীপাতা থেকে আরম্ভ করে কালীঘাটের পট পর্যন্ত সব আছে। নীল চোখ আর গৌরবর্ণ না হলে কারও সাধ্যি ছিল না একে বিদেশী বলে।

—"ভারতের মাটীতে যা আছে অমূল্য। ভারতবাসী সে সব নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ পায়না। অজ্ঞাতই থাকে তথ্য।"

এ্যাস্ষ্ট্রিড্ ও সদানন্দ স্বামীর কথাগুলো শুনে যাই। জবাব দেবার মত কিছুই ছিলনা।

—"কাজ আমার শেষ হয়ে এসেছে প্রায়। শ্রীচৈতন্যের লীলা তথা ভগবানের লীলাই আমার বিষয়-বস্তু।"

জার্মান ভাষায় লিখছেন সদানন্দ, এ্যাস্‌ষ্টিড্‌ তারই অনুবাদ করেন সুইডিস ভাষায়। প্যারিতেও এদের কেন্দ্র আছে মনে হোল।

—"ভবিষ্যতে রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে যে লড়াই সুরু হবে তার কবল থেকে ইউরোপের কোন দেশই রক্ষা পাবে না। তার আগেই ভারতের দর্শন ও বাণী পৌঁছে দিতে হবে ইউরোপে—"

ছ'জনেরই মুখ চিন্তাকুল।

বটানিক্যাল্‌ গার্ডেনে গঙ্গার কুল ঘুরে এ্যাস্‌ট্রিড্‌ নিঃশ্বাস নিলে;—"কি পার্থক্য হাওড়ার সে অঞ্চলের সঙ্গে এখানকার। চোখকে বিশ্বাস করা যায় না।"

দক্ষিনেশ্বরে ভিখিরীর দল। কী লজ্জা।

—"মনুষ্যত্বের অপমান,"—বলি আমি।

—"পৃথিবীর সব মানুষগুলোকে এক ছাঁচে ঢালাই করতে করতে, শেষে নতুন গবেষণার জন্য দ্বিতীয় পৃথিবীর সন্ধান করতে হবে। শিক্ষিত মানুষের জীবনে অশান্তির যে কি অসহায় আর্তনাদ এরা জানেনা এখনো তা। থাকতে দাও এদের এদেরই মতো করে।"

—"যাই বলো ভিক্ষাবৃত্তির মতো দীনতা সহ্য করা যায়না। দেশের কলঙ্ক এই ভিক্ষুক শ্রেণী—"

—"আমরা কি করেছি বলতো? ছাঁচে তো ঢেলেছি আমরা সকলকে। অন্যদের শিক্ষিত করার জন্য হৈ হৈ করেছি।

এখন মনে হচ্ছে কি হয়েছে এতে! কি পেয়েছি আমরা? সকলকে জায়গা দাও, তার মতো সে বেড়ে উঠুক। তুমি যাদের জন্য ছক আঁকছো, সেই তুমিই যে ঠিক তাও বা কে জানে! সারা জগতটাতে হানাহানি শুধু এই নিয়ে। সত্যিই কি কল্যাণ তারা চায় মানুষের? ক্ষমতার লোভ পেছনে রেখে তারা হাত বাড়ায়;—নিরীহ মানুষ তাদের শিকার হয়—"

ফিরে যাবার সময় বললে এ্যাস্ট্রিড্—"আশ্চর্য দেশ ভারতবর্ষ। আমি আবার ফিরে আসবো। মনে হচ্ছে নিজের দেশ। নতুন আসিনি আমি এদেশে।"

আরও একটি কথা বলেছিলো বারবার—"ইউরোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধে সাবধান থেকো। নিজের যা কিছু তাকে রাখো। তোমাদের স্কুল দেখে মনে হলো এতো পুরো নকল ইউরোপের। তোমাদের নিজের জিনিষ কোথায়?

বলরামপুর বেসিক শিক্ষাকেন্দ্র দেখে সে খুশী। বললে—"প্রকৃত ভারতবর্ষের কিছুটা চেহারা দেখলাম গ্রামের কোলে, এসব শিক্ষায়তনে।"

কোলকাতারই এক বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে দেখলে সবই বিলেতী পরিবেশ। ফিরে এসে বললে—

—"তোমাদের আসল জিনিষ কৈ? এও যে নকল।"

অন্য এক বাড়ীতে গিয়ে দেখলে মেয়েরা শুধু রান্নাতেই কাটায় বত্রিশ ব্যঞ্জন তৈরী করতে।..."কি সাংঘাতিক ব্যাপার। সারাদিন রান্না? তাহলে সারা জীবনটিই রান্না! জগৎ কি সীমাবদ্ধ?"

বিড়লার বাড়ী ও চৌরিঙ্গীর ভিখিরীর তুলনা করে নিঃশ্বাস ফেললে। বললে···"বিচিত্র দেশ তোমাদের!!"

বিচিত্র বৈকি! পরের ছিটে ফোঁটা নিয়ে আত্মগৌরব বাড়াবার ব্যর্থ প্রয়াস নইলে কেনই বা।

আলেকজাণ্ডারও কি এমন বিকৃত করে বলেছিলেন··· বিচিত্র দেশ এই ভারতবর্ষ, সেলুকস্। বিদেশীর চোখ কি ভোলে আমাদের রুজ, পমেটমে অথবা পণ্ডস্ ক্রীমে?

চোদ্দ

শ্যামদেশীয় এক কালো বেড়াল আর তার চারটি বাচ্চা নিয়ে শ্রীমতী ক্যালিনিন দরজায় দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন। ঘন কালো নকল সিল্কের পোষাকের সঙ্গে বাটন হোলের লাল গোলাপটি বড় সুন্দর মানিয়েছে। পুষি বেড়ালেরই মতো গাব্দাগোব্দা মেয়ে শ্রীমতী।

ফিনল্যাণ্ডের দেশরক্ষা সচিব ছিলেন শ্রীযুত ক্যালিনিন। বছর কয়েক হলো অবসর নিয়েছেন।

হেলসিঙ্কি সহরে একখানা ফ্ল্যাটের তিনতলায় তিনখানা রুমের ভাড়াটে তারা অন্যান্যদেরই মতো।

কোন হাঁক্ ডাক্ হলোনা। কদম্ কদম্ বাড়িয়ে কায়দা করে ঘরে ঢোকার প্রয়োজনও হলোনা। তবুও মনের আশা—চাপরাশী, বয়, কেউ অন্ততো এক কাপ চা বা কফি হাতে নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াক! মর্যাদা মাফিক হুকুম না থাকলো তো কি আবার সচিব!

সিগ্রেট দিয়েই প্রথম আপ্যায়ন সুরু। অতিথির সে সব বালাই নেই জেনে আনলেন ভালো শ্যাম্পেন। তাও নয় জেনে নিয়ে এলেন ব্ল্যাক্বেরী জুস্ শ্রীমতী নিজেই।

গাড়ী নেই নিজেদের, তাই এক বন্ধুকে পাঠানো হয়েছিল,

ট্যাক্সি করে নিয়ে আসতে আমাদের। ওদের নিমন্ত্রিত অতিথি সেদিন আমরা।

বস্‌বার ঘরটি না পূবের, না পশ্চিমের,—দো-আঁশ্‌লা। টেবিল-চেয়ার-শোফার পশ্চিমী রূপ আর ঘরের অন্য আসবাবে পূবালী হাওয়া। ফায়ারপ্লেসের ওপরে ভারী সুন্দর ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্তি; আর দেয়ালে টাঙানো দিল্লী, আগ্রা, ইরাণ থেকে আনা নানা কারুকার্যে ভরা—পেতল কাসার হরেক রকমের বাসনকোসন। শ্রীযুত ক্যালিনিন ঘুরেছেন প্রায় সমস্ত মধ্য-প্রাচ্য, ভারতবর্ষ, চীন;—শান্তিসম্মেলনে প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলেন। সংগ্রহ করা প্রচুর জিনিষ। সবই সাজিয়ে রেখেছেন ঐ বসারই ঘরে। শেড্‌ দেওয়া টেবিল ল্যাম্পে আলো আঁধারি ঘরখানায় যাদুঘরের মিল আছে।

—"ওটা কি বলতো?"

শ্রীমতী আমার দৃষ্টি নিয়ে গেলেন ভেতরে যাবার দরজার পর্দায়।

—"ওহো, এযে শাড়ী আমাদের—"

—"আমার স্বামী এনেছিলেন ভারতবর্ষ থেকে। কিন্তু কি করে পরতে হবে শিখে উঠতে পারিনি, তাই কি করি; দরজার পর্দা করেছি—"

কটকের শাড়ী। সুন্দর পল্লু। ষ্টেজের সামনে উইংস্‌ এর মতো ঝোলানো! তাও মন্দের ভালো! কেটে যে পর্দা সেলাই হয়নি, তাও রক্ষে!

—"তুমি শিখিয়ে দিও আমাকে—"

—"তা শেখাতে পারি, কিন্তু যখন একবার তাকে পর্দা করেই তুলেছ, তখন ওখানেই থাকতে দাও; ও অভ্যাস করে উঠতে পারবে না।"

—"অত বড় একখানা কাপড় শরীরে রাখা তো আর স্কার্টের মত সহজ নয়, ও নিয়ে কাজ করা যায়না—কি বল ?"

শ্রীমতী ভাবপ্রবণ নন মোটেই, বোঝা গেল। সারা ইয়োরোপের ছেলেমেয়েরাই বুঝে উঠতে পারেনা, এমন একখানা কাপড় জড়িয়ে ভারতীয় মেয়েরা চলেই বা কি করে, কাজই বা করে কি করে আর সাঁতারই বা কাটে কেমন করে! মিঃ হীট্‌ন, যুক্তরাষ্ট্রের ছাত্র, একই ক্লাশে ছিলাম। কাপড় পরে' সাঁতার কাটি, একথাটা আমার ঠাট্টা নয় তার প্রমাণ নেওয়ার জন্য ঘুরে ঘুরে প্রশ্ন করেছিলেন বিভিন্ন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের। শেষটায়ও মাথার চুলে হাত বুলিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন—"বাট্ হাউ (but how) !"

ছোটখাট লাইব্রেরীটি সত্যিই সুন্দর। কথা উঠলো, ইয়োরোপের মধ্যে একমাত্র জার্মানীই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান ও উৎসাহ রাখে। যে ইংরেজ এতদিন রাজত্ব করেছে আমাদের দেশে, তারাও এত জানেনা; অন্যদেশগুলো তো নয়ই।

—"আমার লাইব্রেরীতে দেখ কত ভারতীয় বই।"

শ্রীমতীর আহ্বানে উঠে গেলাম।

—"মহাত্মা গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথের কি কি বই আছে তোমার ?"

—"তোমাদের দেশে লিখেছিলাম রবীন্দ্রনাথের এক সেট বই পাঠাতে তা কেউই পাঠালো না। নিজেই কিনে নিলাম। মহাত্মা গান্ধীর আত্মজীবনী আছে। ইণ্ডিয়ান ফিলসফির বইও আছে।"

ফিলসফির বই দেখে চক্ষু চড়কগাছ না হলেও অনেকটা সেরকমই। একজন আমেরিকান ভদ্রলোকের লেখা ভারতীয় সাধু সন্ন্যাসীদের কথা এবং যোগ ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তার মতামত। সে এক অদ্ভুত বই। মনে হয় ভারতবর্ষ ঘুরে পথে ঘাটে যাকেই সাধু সন্ন্যাসী মনে করেছেন ছবি তুলে এনেছেন—যেন ভারতবর্ষ বলতে বোঝায় উলঙ্গ সাধু-সন্ন্যাসী-দের বাসভূমি। দুঃখ হলো দেখে।

—"কতো ভালো ভালো বই আছে আমাদের দেশে, এযে রীতিমতো বাজে বই,—" অনুযোগ করি।

কথার মাঝে এক সময় উঠে গেলেন শ্রীমতী। "ডিনার রেডি" বলে আবার এসে দাঁড়ালেন। গল্‌দা চিংড়ীর ঘন স্যুপ নিয়ে এলেন তিনি নিজেই।

—"আমার তৈরী চিংড়ীর স্যুপ। ফিনল্যাণ্ডে এ হলো সবচে' ভাল খাবার।"

সাহায্যকারিণী কাউকে দেখবো আশা ছিল তাও না। একটা খাবার শেষ হয় আবার উঠে গিয়ে নিয়ে আসেন অন্য

প্লেট। ডাক্, হাঁক, ব্যস্ততা কিচ্ছুটি নেই। হাসিখুশী শান্ত আবহাওয়ার কোথাও ছেদ পড়ছেনা।

—"আমি সহরে আসতে চাইনা জানো? আমার স্বামী মাঝে মাঝে ধরে নিয়ে আসেন সহরে। অনেকদিন ছিলেন ভারতবর্ষে আমাকে ফেলে। যেদিন ফিরে এলেন সারা রাত ধরে কী গল্প, কী গল্প। কত জিনিষই না আনলেন।"

তারপর অট্টহাসি হেসে খুন। সরলতা আর কেমন যেন এক আত্মভোলা ছেলেমানুষীতে ওকে ভাল লাগে। ঘরোয়া বৈঠকের মিষ্টি আমেজ আছে এর আলাপে। ইংরেজী বলে ধরে ধরে;—বুঝতে কষ্ট হয়না।

—"চলনা, আমার গ্রামের বাড়ীতে। এবার খুব বড়ো বড়ো আলু হয়েছে। চমৎকার বীন, ষ্ট্রবেরী আর আপেল প্রচুর। পিয়ার্স এর তো কথাই নেই—।"

—"সহর ও নগর তো পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই সমান, আমার তাই দেখতে ইচ্ছে করে তোমাদের গ্রাম।"

—"লেকের ওপারে আমাদের জমি। ছোট একখানা বোট আছে পারাপারের জন্য। তোমার ভালই লাগবে।"

ফিনল্যাণ্ড তো লেকের রাজা। সুইডেনের মতো এ-টুকরো ও-টুকরোর সংযোগ করা হয়েছে সেতু ফেলে। কতকগুলো আদিরূপ নিয়েই অরূপা করেছে হেলসিঙ্কিকে।

"তোমার ক্ষেত-খামার দেখাশোনা করে কে? ক'জন লোক আছে কাজ করার!"

—"কাজ করবে আবার কে ?"

শ্রীমতীর চোখ দু'টো আরও ডাগর হয়ে ওঠে।—"আমার কাজ আমিই করি।"

"তোমাকে সাহায্য করার জন্য তো লোক আছে, সে কথাই জিজ্ঞেস করছি।"

—"বলেছি তো কেউ নয়। যখন আমার স্বামী আসেন গ্রামে তখন তিনি সাহায্য করেন মাত্র। অন্য সময় আমার ক্ষেতে আমিই কাজ করি। দেখবে চলো কি চমৎকার সব তরকারী হয়েছে এবার।"

কল্পনায় জাগলো ক্যালিনিনের গ্রাম, তার ছোট বাড়ীটির ছবি। মনে হলো ছবির মত জীবন শ্রীমতী ক্যালিনিনের। আনন্দ ও স্বাস্থ্য পাশাপাশি থেকে জীবনটিকে ভরিয়ে দিয়েছে ফলের রসের মতো। অমন মেয়ে একেবারে একা থাকে কেমন যেন ঠিক বিশ্বাস হলোনা নিজ দেশের গ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে।

—"একা থাক, ভয় করে না ?"

—"ভয় ? ভয় করবে কেন ? আমার একটি এ্যালসেশিয়ান কুকুর আছে—ইয়া বড়ো, সেই আমার সাথী। এছাড়া আশে পাশে কতো লোক, প্রয়োজন হলে তারা আছে।"

শ্যামদেশীয় পুষি ছাড়া আরও পুষি আছে। ছেলের আদরে বাড়ছে সব।

—"বাচ্চাগুলো বিছানা না পেলে শোবে না। অন্য কেউ

নেই তো বাড়ীতে, বেশ কিছুটা জায়গা ওদের দিয়েছি থাকতে।" মানুষেরই থাকার জায়গা হয় না, বিড়াল পরিবারের যত্ন দেখে হিংসে হলো বৈকি। অবশ্য ওরা তো এখন আর বেড়াল নামক জন্তু নয়, শ্রীমতী ক্যালিনিনেরই ছা-পোষা, ছেলে-মেয়ে সব।

কথা ওঠে মাংস খাওয়া নিয়ে। গরুর মাংসে আপত্তি কেন প্রশ্নের জবাবে বলি ;—"গরু দুধ দিয়ে অনেক পরিবারে ছোট ছেলেমেয়েকে মানুষ করে। এভাবে সে পরিবারের একজন এবং আত্মীয় বন্ধুর মত হয়ে দাঁড়ায়। ঐ সেন্টিমেণ্টই—গো-সেবাতে দাঁড়িয়ে গেছে। নইলে আমাদের পুরাণও স্বীকার করেছে, গো-মাংস ধর্মে নিষিদ্ধ ছিলনা সুরাব মতো।"

—"ঠিক, ঠিক। আমাদের যতগুলো বুড়ো মুর্গী আছে, তাদের একটাকেও না পারছি মারতে, না বেচতে।"

প্রাণখোলা হাসিতে গমগমে ঘর।

—"কাঁধের উপর উঠে, মাথায় চড়ে বিরক্ত করে কত! ডিম দেয়না কতদিন ধরে। মারতে পারি কি তবু? ওরা আমাদের ছেলেমেয়ে, কি বল ?"

উত্তরে শ্রীযুত ক্যালিনিন মাথা দুলিয়ে হাততালি দিতে থাকেন—"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।" গ্রাম ও মাটির ফসলের গর্বে শ্রীমতী ক্যালিনিনের দু'চোখ উজ্জ্বল। ঐ মাটিতে যাবার নিমন্ত্রণ বারবার জানিয়ে বিদায় দিলেন।

ভাবছি, ক'জন সচিবের স্ত্রী আছেন আমাদের দেশে যারা

মাটিতে পা ছুঁইয়ে ফসল তৈরী করে আনন্দে উল্লাসে বলতে পারেন—"কত বড় আলু হয়েছে আমার ক্ষেতে!" স্বাধীন দেশের আলো হাওয়ায়ও স্বাধীনতা। স্বামীর পদগৌরবে গৌরবান্বিত নারীরা আমাদের মুল্লুকেই শুধু তলোয়ার শূন্য চকমকে খাপের মতো!

"তোমার আসন শূন্য আজি, হে বীর পূর্ণ করো" বলে কাঁদতে সাধ যায়!

পনের

'স্টক্হলম্' (Stockholm), এর বনানী পেরিয়ে ইয়োরোপ-খ্যাত ভাস্কর কার্লমিলেচ্ (Carl Milles) এর বাড়ীখানা ছোট একটুকরো পাহাড়ের উপর। বেঁচে থাকতেই তিনি নিজের স্বপ্নকে রূপ দিয়েছেন বাড়ীখানাকে যাদুঘর বানিয়ে। ছোট-বেলায় তাঁর নাকি ভালো খাওয়া জোটেনি, আজ কুবের ভাণ্ডার উজার করে দিয়েছেন, শুনলাম।

ছোট ছোট টুক্রো করা দ্বীপের সমষ্টি স্টক্হলম্। সেতু দিয়ে এক অংশের সঙ্গে যুক্ত অন্য অংশ।

গাড়ী, সাইকেল আর পায়ে চলার আলাদা পথ। পায়ে চলা পথে চলছিলাম আমরা তিন-চারজন। মেয়েদের একজন আমাদের গাইড। দ্বিতীয় জনের সঙ্গে প্রাণের যোগ হলো ঐ যাদুঘরেই।

লম্বা সেতু পেরোতে কি চাট্টিখানি সময়? ঐ সময়টুকুতে শ্রীতারাশঙ্করের একখানি বড় গল্প শেষ করা যায়!

অন্য সঙ্গীরা এত জোরে পা চালিয়ে গেছেন, দূর থেকে শুধু তাদের ছায়াটি নড়ছে। কিছুদূর গিয়ে তাদের অপেক্ষা করতেই হবে জানি। কারণ আমরা বিদেশী, তাদেরই হেফাজতে। ফেলে যেতে পারবেনা, নিঃসন্দেহ।

ঘন জঙ্গলের উপর শেষ সূর্য্যের রোদ এসে পড়েছে, সেতুর নীচের জল রূপালী দেখাচ্ছে। অসমাপ্ত পুলের একপাশ ঘেষে আমরা দু'জন এগোচ্ছি মন্থর গতিতে। লোভেল হাতে হাত গলিয়ে একরকম যেন বয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমার সবটুকু বোঝাই। ইয়োরোপে প্রেমিক প্রেমিকারা (?) চলে এমনি আত্মহারা হয়ে। বন্ধু পেলেও অমন আত্মহারা হওয়া যায় বৈকি! দু'জনেই আমরা ভিনদেশী, আলাপ মাত্র সাতঘণ্টা আগে। পোযাক ভিন্ন না হলে পথিকজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবার কারণই ছিল না।

শ্রীমতী লোভেল বাকিংহাম প্যালেস্ রোডের বাসিন্দা। স্ক্যানডিনেভিয়ান দেশগুলো দেখতে এসেছেন শিক্ষার্থী হিসাবে।

বর্তমান ইয়োরোপে উত্তর অঞ্চলের দেশ কটিই সত্যিকারের সংযত ও সংহত শক্তির অধিকারী। দক্ষিণ অঞ্চলের নীতিহীন (?) উগ্রতার ঢেউ বাধা পেয়েছে এদের সমাহিত আত্মশক্তির আঘাতে। এ বিশ্বাস জন্মেছে হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ড দেখে। কিন্তু লোভেলও যে তা স্বীকার করবে ভাবিনি। অধ্যাপক হল্যাণ্ড সাহেব—প্রশ্নের উত্তরে সব সময়েই একটা মজার কথা বলতেন,—"জান না, ইংরেজ মনে করে দুনিয়াতে সেই ই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জাতি?" কথাটির ভেতরে যে আত্মসমালোচনা আছে রসিকতার আড়ালে;—ইংরেজ চরিত্রের ভালমন্দ দু'টো দিক বোঝাতেই তা যথেষ্ট।

লোভেলও ঐ মনোভাবী ইংরেজ। অন্যদেশও যে শক্তির অধিকারী হতে পারে সে তা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত নয়।

অসলোসহরে এসেছে নরওয়েবাসীদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে জানতে। সমাজ বিজ্ঞান এবং সমবায় সমিতির মাধ্যমে একত্রীভূত শক্তির যে সমস্ত কাজ চলছে নরওয়ে সুইডেন প্রভৃতি দেশে সে সম্বন্ধে শিক্ষালাভই তার উদ্দেশ্য। পরিবারের একজন হয়ে থাকতে না পারলে বিদেশের কোন পরিবার তথা সমাজকে ঠিকমতো জানা সম্ভব নয়। তাই কোনও এক পরিবারে সহায়ক হয়ে কাটালে লোভেল কয়েক সপ্তাহ।

বাকিংহাম অঞ্চলের ডোমেষ্টিক সায়ান্স ট্রেনিং কলেজের ছাত্রী লোভেল আজ তারই অধ্যাপিকা।

মাস ছয়েক আগে—ঐ কলেজেরই অধ্যক্ষের অবসর গ্রহণ উপলক্ষে অর্থ সংগ্রহ করা হোল। প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদির পরেও দেখা গেল টাকাটি বাড়তি আছে। কি করা যায় প্রশ্ন উঠলো। পরামর্শে ঠিক হলো ঐ কলেজেরই প্রথম প্রাক্তন ছাত্রী এবং বর্তমান অধ্যাপিকাকেই মাস চারেকের বৃত্তি দিয়ে গৃহ-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছুটা উচ্চ শিক্ষার জন্য স্ক্যান্‌ডিনেভিয়ার দেশগুলোতে পাঠানো হবে।

লোভেলই সে পুরস্কার পেয়েছে। নরওয়ে দেখা শেষ করে সুইডেনে এসেছে।

সুইডেনের সমাজতন্ত্রবাদী সরকারের পরিচালনায় কতকগুলো সংস্থা (Social Welfare Centre) আছে। কয়েকটি কেন্দ্রে

নানা শ্রেণীর শিশুদের রেখে একই রকম পরিবেশে শিক্ষা দেওয়ার গবেষণা চলছে। প্রত্যেক শিশুকেই মাথা পিছু একটা বার্ষিক সাহায্য দেওয়া হয়, সে যে শ্রেণীরই হোক বা যে পরিবার থেকেই আসুক। এমন অনেক শিশু আছে যাদের পিতামাতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু সে প্রশ্নকেই বড় করে দেখা হয়নি কোথাও। মানুষই সমাজ তৈরী করে, সমাজ মানুষেরই জন্য। উপযুক্ত যত্নের অভাবে—অপরিচ্ছন্ন পরিপার্শ্বে যে সমস্ত শিশু বেড়ে উঠবে, বড় হয়ে তারাই অতীতের গ্লানি ও সমাজের নিষ্ঠুরতার কথা জেনে নিজেদের অসহায় বোধ করবে। তারপর সমাজে দস্যু বনবে তারাই। প্রতিহিংসা তাদেরই অন্যায়ের সৃষ্টি-করবে সমাজের ভেতরে, —বর্তমান মনস্তত্ত্ববিদদের এই নিশ্চিত বিশ্বাস। সেই সুদূর প্রসারী দৃষ্টি নিয়ে সুইডেনের সরকার তথা সমাজ দায়িত্ব নিয়েছে সকল রকমের ও সকল শ্রেণীর শিশুদের। মা বাবাদের অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে তারা নারাজ। সেজন্য পরিদর্শকের ব্যবস্থা রেখেছে। এরাই খোঁজ খবর নিয়ে পরিবারকে সুখী করে দিতে চেষ্টা করেন। অথবা প্রয়োজন হলে শাস্তি ইত্যাদিরও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু শিশুমাত্রই যে অপাপবিদ্ধ, এ কথাতেই তারা জোর দিচ্ছেন।

তর্ক যে হলোনা এ নিয়ে তা নয়। ভারপ্রাপ্ত মহিলা প্রগতিবাদী এ বিষয়ে, সংস্কারের চেয়ে জীবন বড়—এই তার স্থির মত।

—"ইংল্যাণ্ডে এখনও "শ্লাম্‌স্‌" আছে, লজ্জার কথা। গত যুদ্ধের পরে ইংল্যাণ্ডে দেখা দিয়েছে নানা সমস্যা। নীতি দুর্নীতির প্রশ্নজালে আমরা এখনও সুইডেনের সমাজপথকে গ্রহণ করতে পারিনি।"

লোভেলের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে একটু বিস্মিত হলাম বৈকি!

—"ইংল্যাণ্ডে তথা বৃটেনেও শিশুদের কল্যাণের নানা ব্যবস্থা আছে। স্কটল্যাণ্ডে দেখেছি বস্তীঅঞ্চল উঠিয়ে ছেলেমেয়েদের জন্য নানা আয়োজন করা হচ্ছে পুনর্গঠনের ভিত্তিতে।" আমি বলি।

—"কোথায় তেমন ব্যবস্থা—"

—"আমরা বিদেশীরা এসে যতটা দেখার সুযোগ পাই তোমাদের, তোমরা ততটা দেখনা আমি মনে করি। ইংল্যাণ্ডকে যে কোন ইংরেজের চেয়ে আমরা বেশী দেখেছি ও জেনেছি।"

—"হয়তো হবে! কিন্তু আমি জানি সমাজের এ দৃষ্টিভঙ্গী এখনো ঠিক আমাদের হয়নি।"

নতুন জিজ্ঞাসা মাথা চাড়া দিলেও লোভেলের চিন্তাকুল মনোভাবে চুপ রয়ে গেলাম!

এবার ভারতবর্ষ বিষয়বস্তু।

আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কি হবে সে সূত্রে নানা প্রশ্নে সে জেনে নিল—যেদেশে হাজার হাজার শিশুর দৈনিক খাবারের

উপযুক্ত ব্যবস্থাটিই নেই—সেদেশে সমাজ সেবা কেন্দ্রের ব্যাপক আয়োজন বা সেভাবে গবেষণার চিন্তা এখনও "দূর্ অস্ত্!" যে গ্রামগুলো আমাদের প্রাণকেন্দ্র সেগুলোই সবচেয়ে বেশী অন্ধকারে। কাজ যদি করতে হয় তো সেখানেই।

লোভেল কি ভাবলে কে জানে! বললে;—"তাহলে অত ছাত্র কি করে তোমাদের দেশ, বিদেশে পাঠায়? কত অর্থ তাতে ব্যয় হয়? কতদূর লাভ হয়েছে তোমাদের এ শিক্ষায?"

উত্তর দেবার মতই প্রশ্ন।

—"ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের চেয়ে ইংল্যাণ্ডেই তাদের বেশী দেখা যায়। নয় কি?"

—"ভাষাই তার কারণ। ইংরেজীটা একরকম আয়ত্বে এসে গেছে। এতদিনের ইংরেজ সাহচর্যই তার কারণ। আবার নতুন করে অন্য ভাষা শিখে নেওয়া কতোখানি সময়ের প্রয়োজন। ভাষা শিখতেই যদি জীবনের সবটুকু সময় যায়, অন্য কাজ হবে কখন?"

—"আমার মতে,—শুধু ইংল্যাণ্ডকে দেখে ও জেনেই তোমাদের ছাত্রের দল দেশে ফিরে যায়। ওতে দৃষ্টি প্রসারিত হয় না।"

আমার মতও তাই জানিয়ে দি।

পায়ে চলা ওর অভ্যাস আছে। তাই সে চলতে পারে মাইলের পর মাইল রুক্‌স্যাক্ পিঠে নিয়ে। খয়েরী রংএর স্কার্ট

ও টুপিতে ওকে মিশনারী বলে ভুল হয়। প্রসাধন বর্জিত দীপ্ত মুখভাব।

—"রং মাখি কি করে! পয়সা কোথায়!"

ঘন নীল চোখের সঙ্গে রংহীন ঠোটদুটো একটু পাংশুটে; কষ্ট সইবার প্রতিজ্ঞা তাতে। সিষ্টার নিবেদিতার ছায়া আছে বুঝিবা মনে;—চেহারার কোথায়ও!

—"চায়ে চিনি না পেলেও আর খারাপ লাগেনা। গত যুদ্ধ আমাদের অনেক শিখিয়েছে।"

সবল হাসিতে ভরে যায় লোভেলের মুখ। ওর ছোট্ট নোট খাতাটিতে কি টুকছে টুক্‌টাক্—ওই শুধু জানে।

চিঠি লিখতেই হবে;—এ প্রতিজ্ঞা নিয়ে বিদায় নি; সহরের ভীড়ে এসে বলিষ্ঠ ঋজুদেহ ওর মিশে যায় সামনের জনস্রোতে।

বৈচিত্র্য একেই বলে। জীবন ওদের কাছে সিগারেটের ধোঁয়া! তারই মাঝে অন্যদের কথা নিয়ে ভাববার সময়ও পায়! আশ্চর্য! মূলকথা শিক্ষা! পুঁথির পাতায়, নয়তো চার-দেয়ালের ঠোকাঠুকিতে শিক্ষা আমাদের রুদ্ধনিঃশ্বাস হয়ে দিন কাটায়। বিদেশী চকমকির তালগোলে শিক্ষা আমাদের নির্জীব। লোভেলদের শিক্ষা পথে ঘাটে, অভিজ্ঞতায়, জীবন-পথে। বিশ্বাস ওদের নিজের শক্তির উপর। রান্নার কাজে সাহায্য করে, বাসন কোসন ধুয়ে, রোজগার করে, পায়ে হেটে, মানুষের সঙ্গে মিশে, অন্যদের সঙ্গে আত্মীয়তা করে খুঁজে নেয় ও

ভরে নেয় তারা শিক্ষার পাত্র। দেশে ফিরে গিয়ে মেরামতের হাতুড়ি তুলে নেয় হাতে। বাটখারা মেপে ওজন করে কতোখানি আছে তাদের, কতোখানি আরও হতে পারে। ওখানে ফাঁকির ফাঁক নেই। দেশকে ভালবাসার গভীর অর্থ আছে তাদের কাছে।

আমাদের দেশের অনেক ধনীগুণীজনের নাতিরা বিদেশে যান নবাবপুত্র সেজে (অনেকে ধার করে নবাব সাজেন!) জীবন উপভোগ করতে, আবার নাত্নীরা যান ওদেশের সস্তা চাকচিক্য নিয়ে ফিরে আসতে! কেউ মিস্ চ্যাটুর্জ্জী, কেউ বা মিঃ রে!! মিঃ বোজে এবং স্যানিয়ালরা এখনও বেঁচে আছেন বৈকি!! দেশে ফিরে তাঁরা ঘোরেন হাওয়ায় হাওয়ায়, দেশবাসীর শিক্ষা আরও দশহাত ওপরে সরে শুধু প্রপেলারের মত গর্জনটি পৌঁছে দেয় নীচে। চায়ে চিনি নেই বা ঠোঁটের রং কেনার পয়সা নেই বলে লোভেলরা যখন দেশের কল্যাণে সে সব ছেড়ে দেয়, আমাদের দিল্লী-হিল্লী-কোলকাতার "হ্যাল্লোর দল" বাজারে গরুখোঁজা করে ফেরেন ঐ সমস্ত জিনিষই!!

শিক্ষা শব্দের অর্থ পরিবর্তন করবে কে বা কারা?

ষোল

উপসালা (Upsala)—সুইডেনের ছোট্ট সহর। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিখ্যাত। যেমন কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড, গ্যাটিংগ্যেন্, শান্তিনিকেতন।

সহরের ছোট্ট ষ্টেশনটিতে ফুলের কেয়ারী করা অংশে দাঁড়িয়েছিলেন অতি সুপুরুষ এবং পদমর্যাদামাফিক গম্ভীর চেহারায় সুইডিশ পার্লামেন্টের সদস্য মিঃ লুণ্ড্বার্গ। স্ত্রীটিও নিশ্চয় কায়দাদুরস্ত, পালিশ করা অতি আধুনিকা কেউ হবেন! মুখে সিগ্রেট চেপে নিশ্চয়ই সম্ভাষণ করবেন—"হ্যাল্লো-ও!" ছবি এঁকে নিলাম মনে মনে।

ভদ্রলোক নিজেই গাড়ী চালিয়ে বাড়ীতে নিয়ে এলেন। বুঝলাম ড্রাইভার নামক দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ নেই।

মস্তো বাড়ী। লিফ্ট্ নেই। অতটা সিঁড়ি ভেঙে চারতলায় উঠতে হবে? ওহরি, ফ্ল্যাট্!! আরও শত শত পরিবার এরকম বাড়ীতে আছেন। সরকার থেকে এ সমস্ত বাড়ী তৈরী হয়েছে অল্প ভাড়ায় প্রয়োজনীয় সুবিধা নিয়ে সাধারণ মানুষ থাকবে বলে।

বাঁকানো সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে লুণ্ডবার্গ কড়া নাড়লেন। দরজা খুলে যিনি বেরিয়ে এলেন, আর যাই হোন তিনি যে বাড়ীর কেউ হবেন না, একরকম ধরেই নিয়েছিলাম।

উস্কোখুস্কো চুল, রংহীন গণ্ড ও ঠোঁট, আধময়লা স্কার্ট। জল লেগে ফেটে যাওয়া হাতের আঙ্গুলগুলো, ময়লা জুতো পায়ে ঘরোয়া চেহারায় সলজ্জ হাসি নিয়ে যিনি এগিয়ে এলেন "ওয়েলকম্" বলে তিনিই মিসেস্ লুণ্ড্বার্গ! পরিচয় দিলেন মিঃ লুণ্ড্বার্গ। তিনটি কিশোর পেছনে দাঁড়িয়ে হাটু নিচু করে মাথা নোয়ালে সামনে নমস্কারের ভঙীতে। তারপর "গুড্ ইভ্নিং" বলে টুক করে সরে যাবার আগেই জিজ্ঞাসা করি— "স্পীক্ ইংলিশ্" ?

—"আ লিট্ল।"

ইংরেজী বলতে পারেন সমস্ত পরিবার ঐ টুকুই। অর্থাৎ "আ-লিট্ল্" (a little) !

—"ছেলেরা ইংরেজী শিখছে এখন স্কুলে। আমরা বলতে পারিনা বুঝি কিছুটা।"—জানালেন মিসেস্।

কোন হোটেলেই জায়গা পাওয়া যায়নি, তাই লুণ্ড্বার্গ-পরিবার নিয়েছেন আমাদের অতিথি করে।

হাতমুখ ধোয়ার পর মিসেস্ নিয়ে এলেন এক ঝুড়ি আপেল। নানা রকমের। টুক্টুকে লাল গোলাপের মত রঙের আপেলই পছন্দ করতাম বেশী। কিন্তু লাল হলুদে মেশানো বড় বড় আপেলই খেতে সবচেয়ে ভালো।

—"জানো, আমাদের দেশে আম ঝুলে থাকে গাছে আপেলেরই মতো। তাই মাঝে মাঝে গাছে উঠে পেড়ে খেতে ইচ্ছে হয় আমের মত। এখানে কেউ তা করে না।

বিদেশী আমি অশোভন আচরণ তো করতে পারি না। তবু সাধ হয়। পেড়েই না খেলাম তো মজাটি কি হলো।"

—"এদেশে ঠিক ওভাবে কেউ খায়না।"

সবচেয়ে বড় আপেলটি হাতে তুলে দিলেন। "খুব ভাল জাতের আপেল।" সঙ্কোচের বালাই নেই এখানে; মুখের সুখ মিটিয়ে খাওয়া গেল।

একটু পরেই উপসালার নানা তথ্যে ভরা সুন্দর এক ছবির বই এনে বললেন—"এ বইটী তুমি নাও। আমার স্বামী খুব খুশী হবেন।" অস্পষ্ট ও অগোছাল ইংরেজী, তবুও ধৈর্য হারালো না আমার। এমন এক মিষ্টিভাব ছিল ওঁর ঐ অবোলা জীবের মত অঙ্গ ভঙ্গীতে নিজেকে প্রকাশ করার চেষ্টায়।

হাতে একটু চাপ দিয়ে বোঝাই, যে বুঝে নিতে কষ্ট হচ্ছেনা তার কথা। একটু খানি স্পর্শও মানুষকে কত কথাই না বুঝিয়ে দিতে সাহায্য করে! ভাষা নেই বলেই পশু পাখীরা গা চেটে সে অভাব পূরণ করে। প্রকাশ করতে না পারার মধ্যে ব্যথা আছে বৈকি!

"ডিনার" বাইরে এক হোটেলে খাওয়ালেন। একটা সুবিধে ইয়োরোপের—কাফে ও হোটেল গুলো। বন্ধুবান্ধব যাকেই নিমন্ত্রণ করা যাক, ঘরে হ্যাঙ্গামার দরকার নেই। খাইয়ে নেওয়া যায় বাইরে।

রাতে "সাপার্"। আমাদের উপলক্ষ্য করে আরও কয়েক-

জনের নিমন্ত্রণ। উপসালা বিশ্ববিত্যালয়ের বাঙালী বৈজ্ঞানিক ডাঃ নীলরতন ধর এবং তাঁর স্ত্রীও আছেন। বৈদেশিক বিভাগের কয়েকজন সুইডিশ কর্মকর্তাও এলেন।

খাবার এলো অনেক কিছুই। বহুত রকমের পিঠে, কেক, বিস্কুট, স্যাণ্ড্‌উইচ, টিনে রাখা মাছ, চকোলেট, কফি। সঙ্গে ফল।

কিন্তু আয়োজনের যিনি কর্ত্রী তাঁর হাসিমুখটুকু ছাড়া অন্য শব্দটি পর্যন্ত নেই। "প্লীজ্, প্লীজ্"—বলে বিনয় দেখাচ্ছেন, বড়জোর।

আপ্যায়ন তো হলো এতজন লোকের। বাসন ধোয়ার কাজটি তো কম নয়। ইয়োরোপে ভদ্রতা হলো নিমন্ত্রিত হয়েও খাওয়ার পরে প্রয়োজন হলে সাহায্য করতে হয় ধোয়ার কাজে। শুনেছি (ঘটনাটি সত্যি) আমেরিকায় এক বিখ্যাত অধ্যাপক ভারতীয় ছাত্রদের নিমন্ত্রণ করতেন প্রায়ই, প্রথম প্রথম সকলে বেশ খুশী হয়ে খেতেন। যখন বাসন কোসন বা ডিস ধোয়ার পর্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হলেন, তখন থেকেই নাকি নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা ভারতীয় ছাত্রদের কাজ হয়ে দাঁড়াল। আমাদের দেশে অসম্মানের কাজ নিমন্ত্রণ খেয়ে থালা ধুয়ে আসা! ইয়োরোপে সেটাই রেওয়াজ! আচার যখন মানুষকে ডিঙিয়ে মাথা তোলে, শাসন করে—তখনই হার হয় মানুষের। সে ত্রুটি আমাদের দেশে যথেষ্ট।

বেডরুম, মিঃ লুণ্ড্‌বার্গএর ষ্টাডি, একটি বৈঠকখানা আর

রান্নাঘর। সামনে ছোট বাথরুম। শেষোক্ত ঘরটি এত ছোট পাশাপাশি ছু'জন দাঁড়াতে পারে না। অতিথি অভ্যাগতদের জন্য আলাদা কোন কামরা নেই। বৈঠকখানার সোফাকে চৌকি করে বিছানা হলো আর হলো লুণ্ড্‌বার্গের ষ্টাডিতে। টি'পয়ে জল রেখে, টেবিলের আলোটি আধবোজা করে দরজা ভেজিয়ে মিসেস চলে গেলেন। একটু পরেই জলের চাপা শব্দে বাইরে বেরিয়ে আসি। রান্নাঘরের দরজায় 'নক্' করি। যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। অতিথি সম্বর্ধনার কাজ শেষ করে এখন তিনি সেরে রাখছেন অন্য কাজ। এক গাদা প্লেট ইত্যাদি একাই ধুয়ে নিচ্ছিলেন। বড় ছেলেটি সাহায্য করছে। মিঃ গেছেন অন্য বন্ধুদের পৌঁচে দিতে। তখনো ফেরেননি।

—"ধোয়া মোছার কাজে অভ্যাস আছে। ভালো লাগে সে কাজ, দাওনা সুযোগ"—বলি। মিসেস আশা করেন নি এতটা। অপ্রস্তুত হয়ে "প্লীজ, প্লীজ" করে জোরে মাথা ছুলিয়ে এক গাল হেসে ফেললেন। তারপর আমাকে ঘরমুখো ফিরিয়ে দিয়ে দরজাটি বন্ধ করে দিলেন ভেতর থেকে।

পরদিন সকাল। এক ফোটা রোদ নেই। টিপ্‌ টাপ্‌ বৃষ্টি ঝরছে, ঠাণ্ডাও বেশ কনকনে। তাহলেও বেরুতে হবে। আমাদের ব্রেক্‌ফাষ্ট অনেক আগেই তৈরী হল। ঠাণ্ডা মাছ, তার ওপর জেলি, টমাটোর টুকরোর সঙ্গে অতি পাতলা করে কাটা ডিম, কাঁকড়ার—মাংস বাটা, রুটি-মাখন, আধা সেদ্ধ কুঁচো

চিংড়ী ; সঙ্গে ছোটজাতীয় মাছের কাঁচা ডিম ! ঐ থ্যাক্‌থেকে ঠাণ্ডা খাবার গিলতে ইচ্ছে করলোনা। মিসেস বসে তদারক করছেন, কিছু খেতেই হলো।—"তোমরা এসেছ বলে আমার ছেলেরা তো স্কুলে যেতেই চাইছেনা।"

—"তা বিদেশী অতিথি বাড়ীতে। স্কুল পালাবার মতো দিনতো বটেই। পাঠ্য-সাথীদের কাছে একদিন তো গল্প করা যাবে আমাদের নিয়ে—"

এ সূত্রে মনে পড়ে। গত খৃষ্টমাসের সময় মিঃ বেবীর বাড়ীতে যখন আমাদের দু'বন্ধুর নিমন্ত্রণ ছিল তখন বাড়ীর তিনটি ছেলেমেয়ের সে কী উত্তেজনা! ছ' সাত দিন ধরে নাকি উৎসাহের সীমা ছিলনা। স্কুলে বন্ধুবান্ধবদের সকলকে নেমন্তন্ন দে'য়া গেলো—"যেও, ইণ্ডিয়ান বন্ধু আসছে দেখতে।" যেদিন পৌঁছালাম সেদিন রাত ন'টা পর্যন্ত জেগে ছিল শুধু দেখাব জন্য, কেমন জীব আমরা! কারণ বন্ধু-বান্ধবেরা নাকি ভারিক্কী চালে ঠাট্টা করেছিল—"ইণ্ডিয়ানরা বড় ডার্টি (dirty) জাননা? ওদের কাছে যেওনা। ওরা কালো ভূত।" বব্‌ ও মেরী একসঙ্গেই বলে উঠেছিল সামনা সামনি পৌঁছামাত্রই—"তবে যে ওরা বলেছিল ইণ্ডিয়ানরা কালো ভূত। তোমরা তো কালো নও। ডার্টি নও!" শিশুদের মুখগুলো ঝলমলে হলো আবিষ্কারের আনন্দে। স্কুল খোলার পরে কিভাবে একটা লড়াই হতে পারে তারই ছক্‌ এঁকে রেখেছিল মনে মনে! লুণ্ড্‌বার্গের ছেলেরাও কি শোনেনি নানা আজব কথা?

ভারতবাসীকে তো অতিথি হিসাবে তারা পায়নি এর আগে!

তিনজনকেই বোঝাই। যাদের জন্যে স্কুল কামাই করবে সারাদিনে তারা তো এক মুহূর্তও বাড়ীতে থাকবে না! নিতান্ত অনিচ্ছায় ওরা চলে গেল। তিনটি উৎসুক কিশোরের অনিচ্ছুক স্কুল যাওয়ার ছবিখানা মনে জেগে রইল মধুর হয়ে।

—"কী সুন্দর পোষাক তোমাদের! আমার ছেলেরা কাল সারারাত প্রশ্ন করেছে শুধু ঐ পোষাক সম্বন্ধে—"

—"দেশের জল হাওয়া হিসাবে পোষাক। তবুও মনে হয় বৈচিত্র্য যদি খুঁজতে হয় তো আমাদের দেশে। ইয়োরোপের কতকগুলো জিনিষ এমন আন্তর্জাতিক তা দিয়ে জাতির বিভিন্নতা বোঝা যায় না। গায়ের রঙ্, পোষাক, রীতি নীতি, ধর্ম, আচার ব্যবহার—প্রায়ই এক মনে হয় দূর থেকে।"

—"না, না, তা কেন হবে! আমাদের আচার রীতি এক নয় মোটেই। ধর্মেও কত বিভিন্নতা। আর পোষাক! উত্তরে যাও, গ্রামাঞ্চলেও তারা নিজেদের জাতীয় পোষাক পছন্দ করে। ছোট স্কার্ট তারা পরে না।"

—"সুইডেনের মেয়েরা জীবনের সুষমা হারিয়ে ফেলেনি, প্যারিস বা লণ্ডনের মেয়ের মতো। দেখে তাই মনে হয়।"

—"এখানকার মেয়েরা একটু শান্ত প্রকৃতির। ঘরের জীবনকে ওরা পছন্দ করছে আজকাল আরও বেশী। গত যুদ্ধের ফলে যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে আমাদের দেশে।"

—"আর একটি কথা ; তোমাদের বড় পরিশ্রম করে বাঁচতে হয়। নয় কি ? ভারতবর্ষে ঝি চাকর পাওয়া যায় এখনও। অনেক ক্ষেত্রে তারা পরিবারেরই একজন হয়ে দাঁড়ায়। তোমাদের এখানে বিপদেও সেরকম একজনকে পাওয়া যাবে না সম্ভবতঃ !"

—"না এখানে সে সুবিধে নেই। সকলেই নিজের কাজ নিজে করে। লোক রাখার মত পয়সা কোথায়! সরকার চেষ্টা করছে নতুন ধরণের বাড়ী তৈরী করে কম ভাড়ায় দিতে। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় সুবিধার ব্যবস্থাও রাখতে যাতে নিজেদের কাজ নিজেদের করে নিতে সুবিধে হয়।"

লুণ্ড্‌বার্গদের এ অঞ্চলে ডেভেলপমেণ্ট স্কীম্‌ অনুযায়ী শত শত বাড়ী উঠেছে ও উঠছে। ফ্ল্যাট্‌ সবগুলিই। যে সমস্ত মেয়ে একা, অবিবাহিতা অথবা স্বামীকে ত্যাগ করেছেন অথচ ছেলেমেয়েদের নিজের দায়িত্বে রেখেছেন সে সমস্ত মেয়েদের খুব কম ভাড়ায় ঘর ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। বাড়ীর সামনে মাঠের মত মস্তো খোলা জায়গা, সেখানে ছেলেমেয়েদের খেলাধূলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাঠটিকে মাঝখানে রেখে বাড়ীগুলো বৃত্তের মতো চারদিকে সাজানো। সব শ্রেণীর ছেলে-মেয়েরাই পরম আনন্দে খেলে বেড়ায়। রাস্তায় গিয়ে গাড়ী চাপা পড়ার ভয় নেই। সামাজিকতা ও সহযোগিতার বীজ এমনি করেই বোনা হয়ে যাচ্ছে।

Tak-Sa-Mycket (অশেষ ধন্যবাদ) বলে আসার সময় শেষ অভিনন্দন জানালেন মিসেস্‌ লুণ্ড্‌বার্গ। ঠিক প্রথম দিনের

দেখা চেহারা। কোথাও পারিপাট্যের চিহ্নও নেই। এ্যাপ্রন পরা ট্রে হাতে দাঁড়ানো মিসেসকে কোন হোটেলের পরিচারিকা বলে ভুল হতে পারে। কিন্তু এমন সুন্দর নির্মল হাসিটিকে কখনো ভুল হতে পারে না—।

—"উঁচু নীচুর তফাৎ আমাদের দেশে নেহাৎ কম। রাজা গেষ্টাভ্-এর প্রাসাদের তুলনায় তাই যাদুঘর অনেক সুন্দর।"

সে পার্থক্য যে খুব কম তার প্রমাণ তো তুমিই—মনে মনে বলি।

সেই সাজ, সেই অগোছাল মাথার চুল, আড়ম্বরহীন। অতি সহজ মেয়ে, সরল হাসিটি মুখে। এরকম মেয়েরাই বাঁচিয়ে রেখেছে ইউরোপের ছন্দটি। দুর্দিনের ঝড়ে ওদের জীবনে এরাই জলন্ত আশ্বাস!

সতের

সন্ধ্যায় আমাদের অভ্যর্থনা জানাবে ইনষ্টিটিউট্ অফ্ সোস্যাল ষ্টাডিজ্ (Institute of Social Studies) এর ছাত্রছাত্রীরা রাণী উইলহেলমিনার প্রাসাদে। রাণী সে প্রাসাদ ছেড়ে দিয়েছেন বিভিন্নদেশের ছাত্রদের জন্য। শিক্ষার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বই উদ্দেশ্য।

যে ঘরে রাজপরিবারের এবং তাদের অতিথি অভ্যাগতদের নাচ গান বা জলসা হতো সে ঘরেই আমাদের গান শোনাবেন হলাণ্ডের বিখ্যাত গায়িকা, বেহালা শোনাবেন স্বনামধন্য বেহালা-বাদক, সঙ্গে পিয়ানো।

রাজকক্ষ, সেকি চাট্টিখানি কথা! অপরূপ সূক্ষ্ম কাজ সিলিং, দরজা ও জানলার গরাদে। সবচেয়ে ভালো লাগলো হলের মাঝখানে এক বিবাট বুদ্ধমূর্তি। ইন্দোনেশিয়া থেকে নিয়ে আশা মনোমুগ্ধকর ভাস্কর্য।

কাঁচের বাতির ঝালরের রোশ্‌নিতে, লাল মখমলের পর্দায় পোষাকের কালো রঙে, ঘরের ভিতর মায়া রচনা করলো। শাঁখের গায়ের মতো শাদা মসৃন রঙ্ গায়িকা ও পিয়ানো-বাদিকার। ছোট্ট রক্ত-গোলাপ কুড়ি বুকের বাঁদিকে; কালো পোষাক ও শাদা গায়ের রঙে মিলে জুলে চমৎকার দেখাচ্ছে। নরম শরম ভাবখানি গায়িকার; অপূর্ব সুরের খেলা কণ্ঠে।

শ্রীমতী লুং ও ডা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল তুলে দিলে তাদের হাতে। দু'হাতে পোষাকটিকে ছড়িয়ে রাজহংসীর মত মাথা নুয়ে অভিবাদন জানানোর আবেগ তাদের যেন শেষ হতে চায় না।

পিয়ানোর আবেশে ভরে আছে ঘর তখনও। ফিস্ ফিস্ করে বললে মিস্ জিমান পেছন থেকে—"কফি খাবে আমার সঙ্গে? বড্ড খুশী হবো।" অপ্রত্যাশিত আহ্বান, পরিবেশের সঙ্গে নেহাৎ বেমানান মনে হলো, বোঝা গেলনা ঠিক। জয়েস্ বুঝিয়ে দিলে যে ওর সঙ্গে কফি খেতে আমায় সাদর নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে। না হলে অতি দুখিত হবে ইত্যাদি। তখন রাত ন'টার পর। শীতের সময়। ভাবলাম প্রাসাদেই কোথাও থাকে হয়তো বা, কফি খাওয়াবে সেখানে। সম্মতি দিয়ে দিলাম।

বড় হলের সামনে দিয়ে বেড়িয়ে যাবার সময় খেয়াল হলো প্রাসাদের বাইরে যাচ্ছি। জিজ্ঞেস করি "কোথায় যাচ্ছ? বাড়ী কি এখানে নয়? অন্যান্য বন্ধুরা লাইব্রেরী ঘরে অপেক্ষা করছে বাংলা গান শুনবে বলে। আমি যেতে পারবোনা। মাফ কর—।"

—"না, না, কিচ্ছুটি দেরী হবে না। নিজে পৌঁচে দিয়ে যাবো। তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই মাত্র। ভারতীয় কোনও বন্ধু আজ পর্যন্ত আমার হয়নি।"

রাস্তায় নেমে আসি দু'জনে।

—"তোমার বাড়ী কতদূরে বললে না—" আবার জিজ্ঞেস করি। ততক্ষণে রাজপ্রাসাদের আওতা ছেড়ে গলিপথে বড় রাস্তায় এসে পড়েছি।

—"আমার বাড়ী? সেতো অনেক দূরে। তুমি কিছু মনে করোনা ভাই। আমার বন্ধুভাগ্য নেহাৎ মন্দ। কেউ কোথাও নেই।···চলো কোন এক কাফেতে গিয়ে বসি। কফি খাবে, সঙ্গে সঙ্গে আমার সবকথা তোমাকে বলবো।"

একটুখানি ভয় যে হলোনা তা নয়। বিদেশ বিভূঁই, ভাষা জানিনা, কাউকে বলে আসিনি··।"

এ প্রসঙ্গে বলে রাখি;—গতরাত্রে অন্যান্য ছাত্রেরা যখন সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনছিলেন আমি তখন ছিলাম বিলিয়ার্ড খেলার টেবিলে। বক্তৃতা শুনে শুনে হয়রান, ঝোঁক চাপলো বিলিয়ার্ড বলের দিকে। এত লম্বা কাঠি, বল্ তাক্ করতে একবারও পারলাম না। হষ্টেলের ক্যান্টিনে ছিল মিস্ জিমান। ওয়েট্রেসের কাজ করে সে। সকাল থেকে রাত ৮টা পর্য্যন্ত তার ডিউটি। ইংরেজী বলতে জানে কাজ চালাবার মতো। এক ডাচ্ ভদ্রলোক উপযাচক হয়ে এলেন খেলা শেখাতে, জিমান মধ্যস্থ হয়ে কথাবার্তা বুঝিয়ে দিল। ভাব জমলো ঐ ভাবে—একটু হাসি ও ত্ব'ঘণ্টার খেলার মধ্যদিয়ে।

হাল্কা শরীর মেয়েটির, যেন ব্যালেরিনা! চাঁপার কলির মত লম্বা লম্বা আঙ্গুলগুলো। সলাজ চোখের ভাষা। কালো

স্কার্টের সঙ্গে শাদা এপ্রনটি ওকে ঘিরে রেখেছে। মানিয়েছে বেশ। প্রথম থেকেই তুলনা করতে ইচ্ছে হয়েছে ওকে ভোরবেলাকার শিশির ভেজা ঝরে পড়া শিউলির সঙ্গে। ভালো লাগবেই (অন্ততো আমার তো ধারণা তাই), ধানের শিষের মতো সোজা পাতলা শরীরটিকে দেখে; বিশেষ করে যখন ধরা পড়বে চোখের কোলে বেদনার জমানো আর্তি আর হাসিতে তা ঢাকা।

—"আমাকে চিঠি লিখবে দেশে ফিরে গিয়ে ?"

—"নিশ্চয়ই।"

—"ভুলে যাবে এখান থেকে চলে গেলেই, আমি ঠিক জানি—।"

—"দেখো তুমি।"

এর পরের ঘটনা,—হেগের রাজপথ। কেমন যেন রহস্য এই ডাচ্ মেয়েটি। তবুও বিদেশিনীর বন্ধুত্বের লোভ! জিমানের অবস্থাও সম্ভবতঃ তাই। নইলে অমন নির্ভরতায় আমার হাতে হাত গলিয়ে একান্ত বিশ্বাসে নিজেরই জীবনের এত সব কথা বলে চললো কি করে? অদ্ভুত এক স্ফূর্তি ওর চোখে মুখে।

জনশূণ্য রাস্তা। সামনেই সারি সারি সাইনবোর্ড কাফে-খানার। জোরালো আলোর বিজ্ঞাপনও কিছুটা ঢাকা কুয়াশার দাপটে। ছ'রাস্তার ঠিক কোনার কাফেটিই পছন্দ হলো জিমানের।—"এ আমার জানাশোনা দোকান।" ভেতরে ঢুকে

একটি কোন্ ঘেষে বসে পড়লো। ওকেষ্ট্রার তালে তালে নাচছে স্ত্রী পুরুষ। "ড্রিঙ্ক" করে কেউ কেউ টেবিলেই ঝড় তুলেছে! কেউ বিস্রস্ত! ধূমপানের প্রবলতা ঘরটিকে ধোঁয়াটে করে রেখেছে;—যেন পল্লীগ্রামের পাক্‌শালা, ধুঁয়ো পাক্ খেয়ে ফিরছে সমস্ত ঘরের আনাচে কোনাচে!

চারদিকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।

লাল টুক্‌টুকে পর্দা দেওয়া কোনটিতে চেয়ারের পিঠে কোট রাখতে রাখতে বললে জিমান—"ওফ্, কি ঘেন্নাই যে করি এদের। শয়তান সব! ছুনিয়া জুড়ে শুধু শয়তান দেখবে—।"

নতুন ঠেকছে জিমানের চেহারা, শান্তচোখে আগুনের ঈশারা!

ওয়েটর কফি আনলে।

—"আর কি খাবে?"

—"কিস্‌সু না। খেয়েই তো এলাম।"

—"আমি গরীব বলে কি?"

—দূর, তা কেন হবে? তবে কিছু মনে যদি না নাও;—এ আবহাওয়া আমার ভালো লাগছেনা।

—"কি করি বলতো! কোথায় যাবো? তোমরা ছাত্র,—কত সুখী,—আর আমি যে ওয়েট্রেস। তোমাদের সঙ্গে বসে গল্প করার সময় সুযোগ কোথায়? তাই তো এখানে আনলাম—।"

—"কেন তোমার বাড়ী?"

বিদ্রুপের হাসিতে ওর ঠোঁটের কোন ভরে গেল।

—"বাড়ী? আমার কি বাড়ী আছে? নইলে কি তোমায় নিয়ে আসি কাফেখানায়?"

হঠাৎ জিমান উঠে গেল। পাশের দরজা দিয়ে অন্তর্ধান। বসেই আছি। হায়, হায়, কার পাল্লায় পড়লাম! ঘেমে উঠেছি! দেখি, জিমান ঢুকছে আর্মির পোষাক পরা একটি ভারিক্কী চেহারার মেয়ের সঙ্গে। পরিচয় দিয়ে বললে—"আমার বন্ধু!"

মিনিট দু'চার নির্বাক বসে মেয়েটি উঠে চলে গেল। একটি কথাও বললে না,—না জিমান, না তার বন্ধুনামক মহিলা! আমি যেন বসে আছি রঙ্গমঞ্চের দর্শকের গ্যালারীতে!

—"এরা সকলেই আমায় তুচ্ছ করে। জানো, এর আগে নেভীতে কাজ করতাম। অপমানের অবধি ছিলনা। সে তোমাকে কি বলি! কতো রকমের লোক, কি নোংরা তারা! আর মেয়েরা সব জায়গাতেই খেলার বস্তু, বুঝলে? আমি ঘৃণা করি পুরুষ শ্রেণীকে। ওরা সাক্ষাৎ শয়তান।"

একটু থেমে চোখ মুছলে রুমালের কোনায়।

কফি ঠাণ্ডা হয়ে দুধের সর জমে উঠেছে পেয়ালার কানায় কানায়। ভ্যাবাচাকা হয়ে ভাবছি কি করে স্বস্থানে পৌঁছাবো এবং কখন! সে ভাবান্তর জিমানের চোখ এড়ালোনা।

—"তুমিও নিশ্চয়ই আমাকে বিশ্বাস করছো না?"

একটু থেমে আবার বললে—"সত্যি বলছি, পারলাম না থাকতে নেভীতে। দিন রাত নিজেকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টায়

অস্থির হয়ে উঠলাম। আমাকে নিয়ে খেলতে চায় উপর-ওয়ালার দল! প্রতিবাদ করলাম। হুকুম তামিল না করলে আমায় কাজে রাখবে কেন ওরা? বললে, "দাও তাড়িয়ে, ও চরিত্রহীন!" ইয়োরোপের মেয়ে চরিত্র নেই বলে কাজ হারায় অবাক লাগছে না?···অন্য মেয়েরাও হাসলে। বললে আড়ালে—"এবার? কেমন সাধু!" নিরুত্তরে চলে এলাম। মেয়েরাও মেয়েদের শত্রু, বুঝলে? এই যে দেখলেনা এক-জনকে! অথচ আমি কি চিনিনা—

—"আঃহা জিমান! কি সব বলছো তুমি! এদের কাউকেই আমি চিনিনা, জানিনা, তাদের সম্বন্ধে শোনার প্রয়োজন আছে মনে করছিনা—।"

একটু বিব্রত হয়ে উঠল জিমান। তবু কি থামে!

—"কাজ খুঁজে খুঁজে হয়রাণ। কোথাও ভালো লাগে না আমার। সব জায়গাতেই সমান, সকলেরই এক চেহারা বন্ধু; —একই চেহারা!—"

—"তা কাজ যদি ভাল না লাগে তো বিয়ে থা করনা কেন?"

—বিয়ে থা? ইয়োরোপকে তুমি জানোনা গার্লি! জানো আমার কতো বদনাম প্রতিবেশীরা দেয়? ঘরে আমায় কেউই নেবেনা সে আমি জানি—।"

ওর অভিজ্ঞতার প্রচণ্ডতায় আমি গার্লি (Girlie) বই কি?

—"আমার মায়ের কথা শুনবে? কত দুঃখিনী মা! বাবার শক্ত বুটের লাথি ছাড়া কোন সম্মানই তার নেই। বাড়ীতে

একদণ্ড থাকতে পারিনা। ভাল লাগেনা। দিনরাত লেগেই আছে খিটিমিটি দু'জনে। মা বড় গরীব, কানাকড়িটিও লুকিয়ে রাখতে পারেননা। সব খুঁজে পেতে নিয়ে আসেন বাবা মদ খাবার জন্য। বুড়ো, অসমর্থ মা, আমি কাজ না করে তো পারিনা!......জগতে আমি সবচে ঘৃণা করি বাবাকে—!"

আমি কি গল্প শুনছি? "লা মিজ্‌রেব্‌ল্‌" এর? অথবা গোর্কীর? ও কেন এসব আমায় বলছে?

নিজেই নিজেকে জবাব দিলাম—গল্পের উপাদান যে জীবন। তাইতো মোপাসাঁ, ডিকেন্স, গোর্কী, রোমাঁরোলার হাতে কলমের রক্তাক্ত স্বাক্ষর।

জিমানের দৃষ্টির শূণ্যতায় অদ্ভুত অনুভূতি!

—"কেন, বাবা কি তোমাদের ভালবাসেন না?"

—"ঘোড়ার ডিম! দেখাই পাই না! কোনও দিন রাতে তিনি বাড়ী ফেরেন না। এক এক সময় তো দিনের পর দিন বাইরে কাটান। মাকে উপোস থাকতে হয়। কাজ আমাকে করতেই হবে। নইলে খাওয়াবে কে?"

—"কলেজের এ কাজ তোমার পছন্দ হয় কি?"

—"নিশ্চয়ই পছন্দ হয়। তা না হলে খুঁজে পেতে এখানে এলাম কেন? সব ছেলেরাই এখানকার শিক্ষিত—ভাল ব্যবহার পাই। অবশ্য বিশ্বাস আমি পৃথিবীতে কাউকেই করিনা।"

হাত ঘড়িতে চোখ বুলোই।—"জিমান, এবার উঠব। তুমি জান আমার জন্যে অপেক্ষা করছে সকলে—।"

—"একঘণ্টাও হয়নি। এরই ভেতর উঠবে? আমাদের দেশে অবসর তো রাতে। দিনে কাজ আর কাজ।"

এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। ডাচ্‌ ভাষায় কি যেন বললেন। জিমানের মুখখানা কঠিন ও আরক্ত।

—"না, আর অপেক্ষা করতে পারবো না। অনুমতির অপেক্ষা না করে গায়ে কোট চড়াই। বাধ্য হয়ে জিমান উঠে দাঁড়ায়। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললে আমার কোট পরিয়ে দিতে দিতে। পেছন দিকে না ফিরেই ও কি যেন জবাব দিলে ভদ্রলোককে। তারপর ত্রস্ত পায়ে বেরিয়ে এলো। ততক্ষণে আমি রাস্তায় নেমে এসেছি।

—"ট্যাক্সি নেবো?"

—"না, কোন দরকার নেই। তোমার পয়সা খরচ করাবার কোন অধিকার আমার নেই। কতই বা বেতন পাও—।"

—"হুঁম্, সত্যি কথা।"

রাজপ্রাসাদের প্রবেশপথে পৌঁচে—বল পাই ফিরে। ভেতরে ঢুকেই বলি—"গুড্‌ নাইট্।" জিমানের প্রত্যুত্তর শোনার ধৈর্য আর তখন নেই। সোজা লাইব্রেরীতে উঠে দেখি অনেকেই তখনো অপেক্ষায়। বিশেষ করে বাঙালী ছাত্র বন্ধুরা। মিঃ সারদ ও মিঃ কানাল—দু'জনেই খুব উত্তেজিত।—"কোথায় ছিলি এতক্ষণ? না বলে কোথাও যেতে নিষেধ করিনি? (এরা দু'জনেই আমার-সতীর্থ। একজন কেনিয়াবাসী পাঞ্জাবী, অন্যজন নেপাল "ত্রি-চন্দ্র" কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের

অধ্যাপক। প্রবাস জীবনে এরা দু'জন আমাকে মেয়ের ও বোনের মত আড়াল করে রেখেছিলেন স্নেহে। এদের কথা কখনো ভোলা যাবে না।) সবকথা খুলে বলি।

—"তুইও যেমন! এসব মেয়েকে কক্খনো বিশ্বাস করতে আছে? এ হলো গিয়ে ইয়োরোপ, বিচিত্র জায়গা! আরও বিচিত্র এদেশের মেয়েরা! খবরদার—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

ওদের হুশিয়ারী কি মেনে নিতে পেরেছি? ঐ জিমান? ওকে? শুধু ভেতরের মনটিকে খুলে ধরার জন্যই কি বিদেশী বন্ধু হিসেবে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল? ইয়োরোপীয় সমাজের কুণ্ঠাহীন উগ্রতার মাঝে সে কি অসাধারণ? মা বাবার পরিচয়ের যে ক্লীবত্ব ও দীনতা সেই কি জিমানকে আঘাত করেছে?

প্রত্যেক কথার পেছনে একবার করে সে বলেছে—"ওহ্, কত যে ঘৃণা করি ওদের!" সম্ভবতঃ সারা জগৎকেই সে ঘৃণা করে। এর জন্যে দায়ী কে?

ওর হাতের বাঁকা লেখা নাম ও ঠিকানা এখনও নোট বই খুললে চোখে পড়ে। ঠিকই বলেছিল জিমান, ও ভেতরের কথা বুঝতে পেরেছিল নিশ্চয়ই। বলেছিল;—"জানি তুমি চিঠি লিখবে না।"

প্রশ্ন করছি মনকে আজ,—সব জেনে শুনে আমিও কি দিতে পেরেছি ওকে বন্ধুত্বের মর্যাদা? জগতে ওর আত্ম-মর্যাদা

বোধের মূল্য কতটুকু ?? সমাজ কি ভেতরের কথা কান পেতে শুনতে জানে ? তা হলে কি খুলে যেতোনা সভ্য-মানুষের ক্লেদাক্ত মুখোস ? জয় হতোনা জিমানদের ব্যথিত প্রতিবাদের ?

…কিন্তু জিমান যে আমার নিজেরই কাছে এক মস্তো জিজ্ঞাসা ! উত্তর তো মেলেনি !

সমাপ্ত